যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন
কোনটি এবং কেন?

গবেষণা সিরিজ-১১

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান

FRCS (Glasgow)

চেয়ারম্যান

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)

১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি

মগবাজার, রমনা, ঢাকা।

ফোন : ০২-২২২২২১১৫০/০২-৪৮৩১৬৭৪৯

E-mail : qrfbd2012@gmail.com

www.qrfbd.org

For Online Order : www.shop.qrfbd.org

যোগাযোগ

QRF Admin- 01944411560, 01755309907

QRF Dawah- 01979464717

Publication- 01972212045

QRF ICT- 01944411559

QRF Sales- 01944411551, 01977301511

QRF Cultural- 0197301504

ISBN Number : 978-984-35-1005-1

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০১

ষষ্ঠ সংস্করণ : আগস্ট ২০২১

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ৯০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই

অথেন্টিক প্রিন্টার্স

২১৭/৩, ১ নম্বর গলি, ফকিরাপুল

মতিঝিল, ঢাকা

ফোন : ০২-৭১৯২৫৩৯, মোবাইল : ০১৭২০১৭৩০১০

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা	২৩
৫	মূল বিষয়	২৫
৬	আইন যাচাইয়ের Common sense সম্মত প্রধান মানদণ্ডসমূহ	২৭
	আইন প্রণয়নকারীর বিশেষ দিকসমূহের শিরোনাম	২৭
	আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিশেষ দিকসমূহের শিরোনাম	২৮
	বিচার ব্যবস্থার বিশেষ দিকসমূহের শিরোনাম	২৮
৭	আইনের যৌক্তিকতা ও কল্যাণকামিতা যাচাইয়ের মানদণ্ডের সাথে সম্পর্কযুক্ত তিন শ্রেণির বিষয়ের প্রধান দিকসমূহের পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত	২৯
৮	**মানদণ্ড-১.১ :** আইন প্রণয়নকারীর জ্ঞানের বিষয়ভিত্তিক (Subjective) বিস্তৃতি	২৯
৯	**মানদণ্ড-১.২ :** আইন প্রণয়নকারীর জ্ঞানের স্থান-কালভিত্তিক বিস্তৃতি	৪১
১০	**মানদণ্ড-১.৩ :** আইন প্রণয়নকারীর সংখ্যা	৪২
১১	**মানদণ্ড-১.৪ :** আইন প্রণয়নকারীর নিরপেক্ষতা	৪৪
১২	**মানদণ্ড-১.৫ :** আইন প্রণয়নকারী ও প্রয়োগকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শক্তি	৪৬
১৩	**মানদণ্ড-১.৬ :** আইন প্রণয়নকারীর স্থায়িত্ব	৪৮
১৪	**মানদণ্ড-১.৭ :** আইন প্রণয়নকারীর কর্তৃত্বস্থলের বিস্তৃতি	৪৯

১৫	**মানদণ্ড-১.৮ :** মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিকে প্রণীত আইনের বিস্তৃতি ও তার আনুপাতিক হার	৫৩
১৬	**মানদণ্ড-১.৯ :** আইন অমান্য করাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করতে পারে এমন কোনো বিষয় প্রণীত আইনে না থাকা	৫৪
১৭	**মানদণ্ড-২.১ :** আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং আইন প্রণয়নকারী ব্যক্তি, সত্তা বা সংস্থার মধ্যে সম্পর্ক	৫৫
১৮	**মানদণ্ড-২.২ :** আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরপেক্ষতা	৫৮
১৯	**মানদণ্ড-৩.১ :** বিচার দুই স্তরে (প্রাথমিক ও চূড়ান্ত) হওয়া	৫৯
২০	**মানদণ্ড-৩.২ :** বিচারক– বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ ও সব ধরনের প্রভাবমুক্ত হওয়া	৬১
২১	**মানদণ্ড-৩.৩ :** আইন, নিরীক্ষণ পদ্ধতি ও মানা বা না মানার পরিণাম মানুষের জানতে পারার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া	৬২
২২	**মানদণ্ড-৩.৪ :** আইন মানা বা না মানার বিষয়টি নিখুঁতভাবে নিরীক্ষণের (Monitoring) ব্যবস্থা থাকা	৬৮
২৩	**মানদণ্ড-৩.৫ :** বিচারের সময় জন্মগতভাবে সুযোগ-সুবিধা বেশি বা কম পাওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় আনা	৭৬
২৪	**মানদণ্ড-৩.৬ :** ওকালতি ও সাক্ষী ব্যবস্থার ধরন	৭৯
২৫	**মানদণ্ড-৩.৭ :** দুনিয়ার বিচারে শাস্তির ধরন	৮১
২৬	**মানদণ্ড-৩.৮ :** শাস্তি থেকে কারও রেহাই না পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকা	৮৫
২৭	**মানদণ্ড-৩.৯ :** পুরস্কারের ধরন	৮৬
২৮	শেষ কথা	৮৭

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে না, নাকি তাদের মনে তালা লেগে গেছে?

সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

সারসংক্ষেপ

আইন হলো মানুষের জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল করার বিধি-বিধান আইন। বর্তমান বিশ্ব মানবতার সামনে দুই ধরনের আইন আছে– মানব রচিত আইন ও কুরআনের আইন। আর ২/১টি বাদে পৃথিবীর সকল দেশে মানব রচিত আইন চালু আছে। ঐ ২/১টি দেশেও কুরআনের আইন আংশিকভাবে চালু আছে। কোনো দেশে একটি আইন চালু হতে বা থাকতে পারে শুধু তখনই, যখন অধিকাংশ মানুষ ঐ আইন চালু করা বা চালু রাখার পক্ষে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় ভূমিকা রাখে বা পালন করে। তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায়– বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ মেনে নিয়েছে যে, মানব রচিত আইন তাদের জীবনকে শান্তিময় করতে সক্ষম।

পুস্তিকাটিতে Common sense-এর ২০টি মানদণ্ডের ভিত্তিতে মানব রচিত আইন ও কুরআনের আইনকে যাচাই করা হয়েছে। এ যাচাইয়ের ফলাফল দেখলে যেকোনো Common sense সম্মত মানুষ অতি সহজে জানতে ও বুঝতে পারবে যে– যৌক্তিকতা ও কল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকে মানব রচিত আইন কুরআনের আইনের ধারে-কাছেও যেতে পারে না। তাই, পৃথিবীর সকল নিষ্ঠাবান মুসলিম, যারা চান তাদের দেশ বা সমস্ত পৃথিবীতে কুরআনের আইন চালু হোক এবং সারা পৃথিবীর মানুষ সার্বিক শান্তিতে জীবনযাপন করুক, তাদের দায়িত্ব হবে ঐ তথ্যগুলো যত দ্রুত সম্ভব সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। কারণ, Common sense-ধারী যারাই ঐ তথ্যগুলো জানতে পারবে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই কুরআনের আইনের যৌক্তিকতা ও কল্যাণময়িতা মানতে বাধ্য হবে। আর এদের মধ্যে যারা সমাজের সার্বিক শান্তি কামনা করে তাদের অনেকেই কুরআনের আইন সমাজে চালু করতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এগিয়ে আসবে বলে আমার বিশ্বাস।

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে বড়ো চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো।

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসূল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দেয়। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করলো–

اِنَّ الَّذِيۡنَ يَكۡتُمُوۡنَ مَآ اَنۡزَلَ اللّٰهُ مِنَ الۡكِتٰبِ وَ يَشۡتَرُوۡنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيۡلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاۡكُلُوۡنَ فِىۡ بُطُوۡنِهِمۡ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيۡهِمۡ ۖۚ وَلَهُمۡ عَذَابٌ اَلِيۡمٌ

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

অনুবাদ : এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।
২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দু'টি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসূল (স.)-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (সুরা আন-নিসা/৪ : ৮০) মহান আল্লাহ রসূল (স.)-কে বলেছেন– পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই, তুমি কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা তোমার দায়িত্ব নয়। কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা আরম্ভ করি। আর বই লেখা আরম্ভ করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসূল (আ.) ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন- এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি- কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং Common sense। কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান। সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি মূল জ্ঞান নয়, বরং কুরআনের ব্যাখ্যা। আর Common sense হলো আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত বা সাধারণ জ্ঞান। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এ তিনটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুস্তিকাটির জন্য এই তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেওয়া যাক।

ক. আল কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

কোনো কিছু পরিচালনার বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হলো সেটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দিয়েছেন। লক্ষ করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মূল বা মৌলিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে কোনো ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলি সম্বলিত ম্যানুয়াল (আসমানী কিতাব) সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঐ আসমানী কিতাবে আছে তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয়। এটা আল্লাহ তা'য়ালা এজন্য করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোতে কোনো প্রকার ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল কুরআন। তাই, আল কুরআনে মানব জীবনের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে (সরাসরি) উল্লিখিত আছে। তাহাজ্জুদ সালাত রসুল (স.)-এর জন্য নফল তথা অতিরিক্ত ফরজ ছিল। ইসলামের অন্য সকল অমৌলিক বিষয়ের কথা রসূল (স.)-কে অনুসরণ করতে বলা কথার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর এটা নির্দ্ধারণ করা ছিল যে, তিনি মুহাম্মদ (স.)-এর পরে আর কোনো নবী-রসূল দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই, তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল কুরআনের তথ্যগুলো যাতে রসূল (স.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরও সময়ের বিবর্তনে মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোনো কমবেশি না হয়ে যায়, সেজন্য কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থের মাধ্যমে সংরক্ষণ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রসূল (স.)-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যেসব বিষয়ে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে সেসব বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হলো– সবক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোনো বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আরেকটা দিক অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যই কুরআন নিজে[১] এবং জগদ্বিখ্যাত বিভিন্ন মুসলিম মনীষী বলেছেন- 'কুরআন তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে– কুরআনের তাফসীর কুরআন দিয়ে করা।'[২]

তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সুরা নিসার ৮২ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন– কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো কথা নেই। বর্তমান পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. সুন্নাহ/সনদ ও মতন সহীহ হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

সুন্নাহ হলো কুরআনের বক্তব্যের বাস্তব রূপ বা ব্যাখ্যা। আর এ ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর নিয়োগপ্রাপ্ত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী রসূল মুহাম্মাদ (স.) তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে। রসূল (স.) নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন

---

১. সুরা আয-যুমার/৩৯ : ২৩, সুরা হুদ/১১ : ১, সুরা ফুসসিলাত/৪১ : ৩

২. ড. হুসাইন আয-যাহাভী, *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরুন*, (আল-মাকতাবাতুশ শামিলাহ), খ. ৪, পৃ. ৪৬

করার সময় আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতি ছাড়া কোনো কথা, কাজ বা অনুমোদন দিতেন না। তাই সুন্নাহও প্রমাণিত জ্ঞান। কুরআন দিয়ে যদি কোনো বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। ব্যাখ্যা মূল বক্তব্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়, কখনও বিরোধী হয় না। তাই সুন্নাহ কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, কখনও কুরআনের বিরোধী হবে না। এ কথাটি আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ۙ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ۙ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ۖ
فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ .

অনুবাদ : আর সে যদি আমার বিষয়ে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাতে (শক্ত করে) ধরে ফেলতাম। অতঃপর অবশ্যই আমরা তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই যে তা থেকে আমাকে বিরত রাখতে পারতে।

(সুরা আল-হাক্কাহ/৬৯ : ৪৪-৪৭)

একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যাখ্যাকারীকে কোনো কোনো সময় এমন কথা বলতে হয় যা মূল বিষয়ের অতিরিক্ত। তবে কখনও তা মূল বিষয়ের বিরোধী হবে না। তাই কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রসূল (স.) এমন কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে ঐ বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীস বিপরীত বক্তব্য সম্বলিত দুর্বল হাদীস রহিত (Cancel) করে দেয়। হাদীসকে পুস্তিকার তথ্যের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে।

গ. Common sense/আকল/বিবেক (মালিকের নিয়োগকৃত দারোয়ানের বক্তব্য)

কুরআন ও সুন্নাহ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তথ্যটি প্রায় সকল মুসলিম জানে ও মানে। কিন্তু Common sense যে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের একটি উৎস এ তথ্যটি বর্তমান মুসলিম উম্মাহ একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে।

বিষয়টি পৃথিবীর সকল মানুষ বিশেষ করে মুসলিমদের গভীরভাবে জানা দরকার। তবে Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কিত কিছু তথ্য যুক্তি, কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে নিম্নে তুলে ধরা হলো–

যুক্তি

মানব শরীরের ভেতরে উপকারী (সঠিক) জিনিস প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর জিনিস (রোগ-জীবাণু) অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা (দারোয়ান) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন জিনিসটি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। যে জিনিসটি ক্ষতিকর নয় সেটিকে সে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করলে তা ধবংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সর্বক্ষণ রোগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানব জীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে সহজে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে।

মহান আল্লাহ মানব জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের ভেতরে দারোয়ানের মতো কাজ করার জন্য মহাকল্যাণকর এক ব্যবস্থা সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। তাই, যুক্তির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার লক্ষ্যে দারোয়ানের মতো কাজ করার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা (উৎস) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়ার কথা। কারণ তা না হলে মানব জীবন শান্তিময় হবে না।

মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সেই মহাকল্যাণকর দারোয়ান হলো বোধশক্তি/Common sense/عَقْلٌ/বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান। অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা যে সকল ব্যক্তি কোনোভাবে ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারেনি, Common sense-এর জ্ঞানের ভিত্তিতে পরকালে তাদের বিচার করা হবে।

আল কুরআন (মালিকের মূল বা ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য)

তথ্য-১

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الۡاَسۡمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمۡ عَلَى الۡمَلٰٓٮِٕكَةِ فَقَالَ اَنۡۢبِــُٔوۡنِىۡ بِاَسۡمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ

اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِيۡنَ.

অনুবাদ : অতঃপর তিনি আদমকে 'সকল ইসম' শেখালেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে উপস্থাপন করলেন, অতঃপর বললেন– তোমরা আমাকে এ ইসমগুলো সম্পর্কে বলো, যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ.) তথা মানবজাতিকে রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে 'সকল ইসম' শিখিয়েছিলেন। অতঃপর ফেরেশতাদের ক্লাসে সেগুলো সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

প্রশ্ন হলো– আল্লাহ তা'য়ালা রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে 'সকল ইসম' শেখানোর মাধ্যমে কী শিখিয়েছিলেন? যদি ধরা হয়– সকল কিছুর নাম শিখিয়েছিলেন, তাহলে প্রশ্ন আসে– মহান আল্লাহর শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে মানব জাতিকে বেগুন, কচু, আলু, টমেটো, গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া, রহিম, করিম ইত্যাদি নাম শেখানো আল্লাহর মর্যাদার সাথে মানায় কি না এবং তাতে মানুষের কী লাভ?

প্রকৃত বিষয় হলো- আরবী ভাষায় 'ইসম' বলতে নাম (Noun) ও গুণ (Adjective/সিফাত) উভয়টিকে বোঝায়। তাই, মহান আল্লাহ শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে আদম তথা মানব জাতিকে নামবাচক ইসম নয়, সকল গুণবাচক ইসম শিখেয়েছিলেন। ঐ গুণবাচক ইসমগুলো হলো– সত্য বলা ভালো, মিথ্যা বলা পাপ, মানুষের উপকার করা ভালো, চুরি করা অপরাধ, ঘুষ খাওয়া পাপ, মানুষকে কথা বা কাজে কষ্ট দেওয়া অন্যায়, দান করা ভালো, ওজনে কম দেওয়া অপরাধ ইত্যাদি।[৩] পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– এগুলো হলো মানবজীবনের ন্যায়-অন্যায়, সাধারণ নৈতিকতা বা মানবাধিকারমূলক বিষয়। অন্যদিকে এগুলো হলো সে বিষয় যা মানুষ Common sense দিয়ে বুঝতে পারে। আর আল্লাহ তা'য়ালা এর পূর্বে সকল মানব রুহের কাছ থেকে সরাসরি তাঁর একত্ববাদের স্বীকারোক্তি নিয়েছিলেন।

---

৩. বিস্তারিত : মুহাম্মাদ সাইয়েদ তানত্বাভী, *আত-তাফসীরুল ওয়াসীত*, পৃ. ৫৬; আছ-ছা'লাবী, *আল-জাওয়াহিরুল হাসসান ফী তাফসীরিল কুর'আন*, খ. ১, পৃ. ১৮

তাই, আয়াতটির শিক্ষা হলো- আল্লাহ তা'য়ালা রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে বেশ কিছু জ্ঞান শিখিয়ে দিয়েছেন তথা জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটি হলো- عَقْلٌ, বোধশক্তি, Common sense বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।[৪]

তথ্য-২

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

অনুবাদ : (কুরআনের মাধ্যমে) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে এমন বিষয় যা সে পূর্বে জানেনি/জানতো না। (সুরা আল-আলাক/৯৬ : ৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি হলো কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়া পাঁচটি আয়াতের শেষটি। এখানে বলা হয়েছে– কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে এমন জ্ঞান শেখানো হয়েছে যা মানুষ আগে জানেনি বা জানতো না। সুন্নাহ হলো আল্লাহর নিয়োগকৃত ব্যক্তি কর্তৃক করা কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই, আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে অন্য একটি জ্ঞানের উৎস মানুষকে পূর্বে তথা জন্মগতভাবে দেওয়া আছে। কুরআন ও সুন্নায় এমন কিছু জ্ঞান সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা মানুষকে ঐ উৎসটির মাধ্যমে দেওয়া বা জানানো হয়নি। তবে কুরআন ও সুন্নায় ঐ উৎসের জ্ঞানগুলোও কোনো না কোনোভাবে আছে।[৫]

জ্ঞানের ঐ উৎসটি কী তা এ আয়াত থেকে সরাসরি জানা যায় না। তবে **১** নম্বর তথ্য থেকে আমরা জেনেছি যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে আল্লাহ মানুষকে বেশকিছু জ্ঞান শিখিয়েছেন। তাই ধারণা করা যায় ঐ জ্ঞান বা জ্ঞানের উৎসটিই জন্মগতভাবে মানুষকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর **৩** নম্বর তথ্যের মাধ্যমে এ কথাটি মহান আল্লাহ সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন।

---

৪. كُلَّهَا শব্দের ব্যাখ্যায় আল্লামা তানতাভী রহ. বলেন- আদম আ.-কে এমন জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়েছিলো যা একজন শ্রবণকারীর ব্রেইনে উপস্থিত থাকে, আর তা তার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। (মুহা. সাইয়েদ তানত্বাভী, *আত-তাফসীরুল ওয়াসীত*, পৃ. ৫৬)

এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরদের একদল বলেছেন- আদম আ.-এর কলবে সেই জ্ঞান নিক্ষেপ করা হয়েছিল। (আন-নিশাপুরী, *আল-ওয়াজীজ ফী তাফসীরিল বিতাবিল আজীজ*, পৃ. ১০; জালালুদ্দীন মহল্লী ও জালালুদ্দীন সুয়ূতী, *তাফসীরে জালালাইন*, খ. ১, পৃ. ৩৮)

৫. مَا لَمْ يَعْلَم এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন- এটি ঐ জ্ঞান যা আদম আ.-কে মহান আল্লাহ শিখিয়েছিলেন; যা সে পূর্বে জানতো না। (*তানবীরুল মাকাবিস মিন তাফসীরি ইবন আব্বাস*, খ. ২, পৃ. ১৪৮; কুরতুবী, *আল-জামিউল লি আহকামিল কুর'আন*, খ. ২০, পৃ. ১১৩)

তথ্য-৩

وَنَفۡسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۙ فَاَلۡهَمَهَا فُجُوۡرَهَا وَتَقۡوٰىهَا ۙ قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ زَكّٰىهَا ۙ وَقَدۡ خَابَ مَنۡ دَسّٰىهَا .

অনুবাদ : আর শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে (মন) সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক) (পার্থক্য করার শক্তি)। যে তাকে (ঐ শক্তিকে) উৎকর্ষিত করলো সে সফলকাম হলো। আর যে তাকে অবদমিত করলো সে ব্যর্থ হলো। (সুরা আশ্-শামস/৯১ : ৭-১০)

ব্যাখ্যা : ৮ নম্বর আয়াতটির মাধ্যমে জানা যায়– মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে 'ইলহাম' তথা অতিপ্রাকৃতিক এক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের মনে সঠিক ও ভুল পার্থক্য করার একটি শক্তি দিয়েছেন। এ বক্তব্যকে উপরোল্লিখিত ১ নম্বর তথ্যের আয়াতের বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে বলা যায় যে, রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মহান আল্লাহ মানুষকে যে জ্ঞান শিখিয়েছিলেন বা জ্ঞানের যে উৎসটি দিয়েছিলেন তা 'ইলহাম' নামক এক পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের মনে জন্মগতভাবে দিয়ে দিয়েছেন। মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া ঐ জ্ঞানের শক্তিটিই হলো Common sense/আকল/বিবেক/বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।[৬]

৯ ও ১০ নম্বর আয়াত থেকে জানা যায় যে, জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense উৎকর্ষিত ও অবদমিত হতে পারে। তাই, Common sense প্রমাণিত জ্ঞান নয়। এটি অপ্রমাণিত তথা সাধারণ জ্ঞান।

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত আয়াতসহ আরও অনেক আয়াতের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে- আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে জন্মগতভাবে জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত বা সাধারণ উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটিই হলো– Common sense/আকল/বিবেক/বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তথ্য-৪

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنۡدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الۡبُكۡمُ الَّذِيۡنَ لَا يَعۡقِلُوۡنَ .

---

৬. যা দিয়ে সে ভালো-মন্দ বুঝতে পারে। (বিস্তারিত : শানকীতী, *আন-নুকাত ওয়াল উয়ূন*, খ. ৯, পৃ. ১৮৯)

অনুবাদ : নিশ্চয় আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির, বোবা যারা Common sense-কে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(সুরা আল আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা : Common sense-কে যথাযথভাবে কাজে না লাগানো ব্যক্তিকে নিকৃষ্টতম জীব বলার কারণ হলো– এ ধরনের ব্যক্তি অসংখ্য মানুষ বা একটি জাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিতে পারে। অন্য কোনো জীব তা পারে না।[৭]

তথ্য-৫

....وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ.

অনুবাদ : ... ... আর যারা Common sense-কে কাজে লাগায় না তাদের ওপর তিনি ভুল চাপিয়ে দেন।

(সুরা ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে- মানুষ যদি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে আল্লাহর জানিয়ে দেওয়া প্রোগ্রাম বা নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবহার না করে তবে ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে।

তথ্য-৬

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ .

অনুবাদ : তারা আরও বলবে- যদি আমরা (সতর্ককারীদের কথা তথা আল্লাহর কিতাব ও নবীদের বক্তব্য) শুনতাম অথবা Common sense-কে ব্যবহার করতাম তাহলে আজ আমাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না।

(সুরা আল মূলক/৬৭ : ১০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে শেষ বিচার দিনে জাহান্নামের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যেসব কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে– যদি তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনতো অথবা ইসলাম জানার জন্য Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতো, তবে তাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না। আয়াতটি থেকে তাই বোঝা যায়, জাহান্নামে যাওয়ার অন্যতম একটি কারণ হবে Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা।

সম্মিলিত শিক্ষা : পূর্বের আয়াত তিনটির ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়- Common sense আল্লাহর দেওয়া অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি জ্ঞানের উৎস।

---

৭. আলূসী, *রূহুল মাআনী*, খ. ৭, পৃ. ৫০।

সুন্নাহ/সনদ ও মতন সহীহ হাদীস (মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারীর বক্তব্য)

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ... حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ .

অনুবাদ : *ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হাযিব ইবনুল ওয়ালিদ থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন– এমন কোনো শিশু নেই যে মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে না। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে; যেমন– চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক, কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে)।

- ♦ মুসলিম, আস-সহীহ (বৈরূত : দারুল যাইল, তা.বি.), হাদীস নং- ৬৯২৬।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির **'প্রতিটি শিশুই মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) ওপর জন্মগ্রহণ করে'** কথাটির ব্যাখ্যা হলো– সকল মানব শিশুই সৃষ্টিগতভাবে সঠিক জ্ঞানের শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এ বক্তব্য থেকে তাই জানা যায়– সকল মানব শিশু সঠিক Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

আর হাদীসটির **'অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে'** অংশের ব্যাখ্যা হলো, মা-বাবা তথা পরিবেশ ও শিক্ষা মানব শিশুকে ইহুদী, খ্রিষ্টান, অগ্নিপূজারী বানিয়ে দেয়। তাহলে হাদীসটির এ অংশ থেকে জানা যায়– Common sense পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দিয়ে পরিবর্তিত হয়। তাই, Common sense সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান; প্রমাণিত জ্ঞান নয়।

হাদীস-২

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ .... قَالَ سَمِعْتُ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي وَيُحَرَّمُ عَلَيَّ. قَالَ فَصَعَّدَ النَّبِيُّ ﷺ وَصَوَّبَ فِيَّ النَّظَرَ فَقَالَ الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ. وَقَالَ لاَ تَقْرَبْ لَحْمَ الْحِمَارِ الأَهْلِيِّ وَلاَ ذَا نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ.

অনুবাদ : *আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে–* আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (স.)! আমার জন্য কী হালাল আর কী হারাম তা আমাকে জানিয়ে দিন। তখন রসূল (স.) একটু নড়েচড়ে বসলেন ও ভালো করে খেয়াল (চিন্তা-ভাবনা) করে বললেন– নেকী (বৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার মন তথা মনে থাকা আকল (নফস) প্রশান্ত হয় ও তোমার মন (ক্বলব) তৃপ্তি লাভ করে। আর পাপ (অবৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার নফস ও ক্বলব প্রশান্ত হয় না ও তৃপ্তি লাভ করে না। যদিও সে বিষয়ে ফাতওয়া প্রদানকারীরা তোমাকে ফাতওয়া দেয়। তিনি আরও বলেন– আর পোষা গাধার গোশত এবং বিষ দাঁতওয়ালা শিকারীর গোশতের নিকটবর্তী হয়ো না।

- ♦ আহমাদ, *আল-মুসনাদ* (মুয়াস্‌সাসাতু কর্দোভা), হাদীস নং ১৭৭৭৭
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : নেকী তথা সঠিক কাজ করার পর মনে স্বস্তি ও প্রশান্তি এবং গুনাহ তথা ভুল কাজ করার পর সন্দেহ, সংশয়, খুঁতখুঁত ও অস্বস্তি সৃষ্টি হতে হলে মনকে আগে বুঝতে হবে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল। তাই, হাদীসটি থেকে জানা যায়– মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যে অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো– Common sense/আকল/বিবেক/বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

হাদীসটির **'যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয়'** বক্তব্যের মাধ্যমে রসূল (স.) জানিয়ে দিয়েছেন, কোনো মানুষ যদি এমন কথা বলে যাতে মন তথা মনে থাকা Common sense সায় দেয় না, তবে বিনা যাচাইয়ে তা মেনে নেওয়া যাবে না। সে ব্যক্তি যত বড়ো মুফাসসির, মুহাদ্দিস, মুফতি, প্রফেসর, চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার হোক না কেন। তাই হাদীসটির এ অংশ থেকে জানা যায়- Common sense অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শক্তি/উৎস।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ... ... حَدَّثَنَا رَوْحٌ ... ... عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ : إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ : إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ .

অনুবাদ : *ইমাম আহমাদ (রহ.) আবূ উমামা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি রাওহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন–* আবূ উমামা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রসূল (স.)-কে জিজ্ঞেস করল, ঈমান কী? রসূল (স.) বললেন– যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, হে রসূল! গুনাহ (অন্যায়) কী? রসূলুল্লাহ (স.) বলেন– যে বিষয় তোমার মনে (আকলে) সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে।

- ♦ আহমদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নম্বর- ২২২২০।
- ♦ হাদীসটির সনদ এবং মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটির **'যে বিষয় তোমার মনে সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে'** অংশ থেকে জানা যায়– মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে, যা অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মানব মনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া সেই শক্তি হলো– Common sense, আকল, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান ।

হাদীসটির **'যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন'** অংশ থেকে জানা যায়- মু'মিনের একটি সংজ্ঞা হলো- সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পাওয়া। আর অসৎ কাজ করার পর মনে কষ্ট পাওয়া। সৎকাজ করার পর মনে আনন্দ পায় আর অসৎ কাজ করার পর মনে কষ্ট পায় সেই ব্যক্তি যার Common sense জাগ্রত আছে। তাই, এ হাদীস অনুযায়ী বোঝা যায় যে– Common sense অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এক জ্ঞানের শক্তি/উৎস।

সম্মিলিত শিক্ষা : হাদীস তিনটিসহ আরও হাদীস থেকে সহজে জানা যায়– Common sense/আকল/বিবেক বা বোধশক্তি সকল মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত বা সাধারণ উৎস। তাই, Common sense-এর রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি উৎস হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞান

মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense-এর এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান বা জ্ঞানের উৎস।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি নির্ভুল হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য একই হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ط ... ...

অনুবাদ : শীঘ্র আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) দেখাতে থাকবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।... ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই, এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য একই হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী বলতে কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত হওয়া জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস Common sense (আকল/বিবেক) ধারণকারী ব্যক্তিকে বোঝায়।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী ব্যক্তির Common sense-এর উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত গবেষণার ফল।

আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র/রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা

যেকোনো বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞানার্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি (Flow Chart) মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ নম্বর এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নম্বর আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা (রা.)-এর চরিত্র নিয়ে ছড়ানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসূল (স.) নীতিমালাটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। নীতিমালাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র/নীতিমালা'** নামক বইটিতে।

প্রবাহচিত্রটি (Flow Chart) এখানে উপস্থাপন করা হলো–

যেকোনো বিষয়

↓

Common sense {আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান} বা বিজ্ঞান (Common sense মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান)-এর আলোকে সঠিক বা ভুল বলে **প্রাথমিক সিদ্ধান্ত** নেওয়া এবং সে অনুযায়ী **প্রাথমিক ব্যবস্থা** নেওয়া

↓

কুরআন (মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে সুন্নাহ (ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে প্রাথমিক সিদ্ধান্তের (Common sense বা বিজ্ঞানের রায়) ভিত্তিতে নেওয়া ব্যবস্থা ও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া

↓

মনীষীদের **ইজমা-কিয়াস** দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে যাচাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে

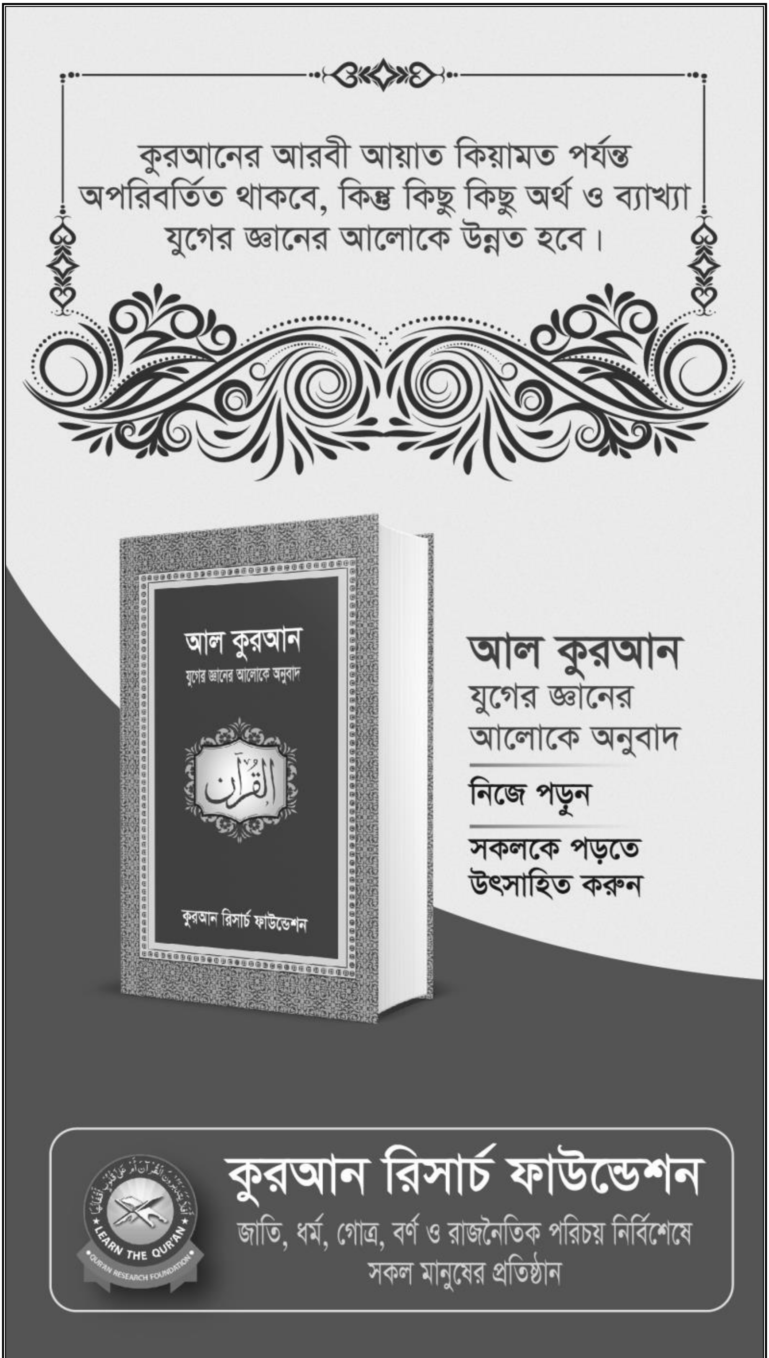
কুরআনের আরবী আয়াত কিয়ামত পর্যন্ত
অপরিবর্তিত থাকবে, কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে উন্নত হবে।
আল কুরআন
যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
আল কুরআন
যুগের জ্ঞানের
আলোকে অনুবাদ
নিজে পড়ুন
সকলকে পড়তে
উৎসাহিত করুন
LEARN THE QUR'AN
QUR'AN RESEARCH FOUNDATION
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
জাতি, ধর্ম, গোত্র, বর্ণ ও রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে
সকল মানুষের প্রতিষ্ঠান

মূল বিষয়

আইন হলো মানুষের জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল করার বিধি-বিধান। বর্তমান বিশ্ব মানবতার সামনে দুই ধরনের আইন রয়েছে– মানব রচিত আইন ও কুরআনের আইন। আর ২/১টি বাদে পৃথিবীর সকল দেশে মানব রচিত আইনই চালু আছে। আর ঐ ২/১টি দেশেও কুরআনের আইন চালু আছে আংশিকভাবে। কোনো দেশে একটি আইন চালু হতে বা থাকতে পারে শুধু তখনই, যখন অধিকাংশ মানুষ ঐ আইনের পক্ষে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয়ভাবে ভূমিকা রাখে। তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায়– বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ মেনে নিয়েছে যে, মানব রচিত আইন তাদের জীবনকে শান্তিময় করতে পারবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মানব রচিত আইন কি মানুষকে শান্তি দিতে পেরেছে? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমরা যদি মানুষকে নানা ধরনের প্রশ্ন করি এবং তার উত্তর পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্তে আসতে চাই তবে তা সম্ভব হবে না। কারণ, শান্তি হচ্ছে একটা আপেক্ষিক বিষয়। একজনের কাছে যেটি শান্তি মনে হবে অন্যজনের কাছে তা অশান্তি মনে হতে পারে। তাছাড়া প্রশ্নমালার ভিত্তিতে মানুষ সার্বিকভাবে শান্তিতে আছে কি না তা পর্যালোচনা করতে হলে জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে অসংখ্য প্রশ্ন অসংখ্যভাবে তৈরি করতে হবে। তারপর প্রতিটি মানুষের কাছ থেকে সেই অসংখ্য প্রশ্নের মন থেকে দেওয়া উত্তর সংগ্রহ করে পর্যালোচনা করতে হবে। এটি একটি অসম্ভব ব্যাপার। তাই, একটি আইন মেনে মানুষ সার্বিকভাবে শান্তিতে থাকবে কি না বা শান্তি পাবে কি না, তা পর্যালোচনা করার সর্বোত্তম উপায় হলো– ঐ আইনকে কিছু মানদণ্ডের (Standard) ভিত্তিতে যাচাই করা। মানদণ্ডগুলো এমন হতে হবে যেন সকল মানুষের Common sense নির্দ্বিধায় বলে দেয়– একটি আইন মানুষের জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল করতে হলে অবশ্যই আইনটিকে ঐ সকল মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে হবে।

তাই, বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হলো, Common sense-এর কিছু মানদণ্ডের ভিত্তিতে মানব রচিত আইন ও কুরআনের আইনকে যাচাই করা। সে যাচাইয়ে যদি দেখা যায় যে, কুরআনের আইন সকল মানদণ্ডে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হতে পারে কিন্তু মানুষ রচিত আইন তা মোটেই পারে না, তবে জোর

দিয়েই বলা যাবে– Common sense অনুযায়ী কুরআনের আইন যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর এবং মানব রচিত আইন তা নয়। আর তখন পৃথিবীর সকল নিষ্ঠাবান মুসলিম, যারা চান তাদের দেশ বা সমস্ত পৃথিবীতে কুরআনের আইন চালু হওয়ার মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষ সার্বিক শান্তিতে জীবনযাপন করুক, তাদের দায়িত্ব হবে ঐ তথ্যগুলো যত দ্রুত সম্ভব সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। কারণ, Common sense-ধারী যারাই ঐ তথ্যগুলো জানতে পারবে, তাদের মধ্যে সবাই না হলেও অধিকাংশই কুরআনের আইনের যৌক্তিকতা মানতে বাধ্য হবে। আর এদের মধ্যে যারা সমাজের সার্বিক শান্তির কথা চিন্তা করে বা কামনা করে তাদের অনেকেই কুরআনের আইন সমাজে চালু করতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এগিয়ে আসবে বলে আমরা বিশ্বাস।

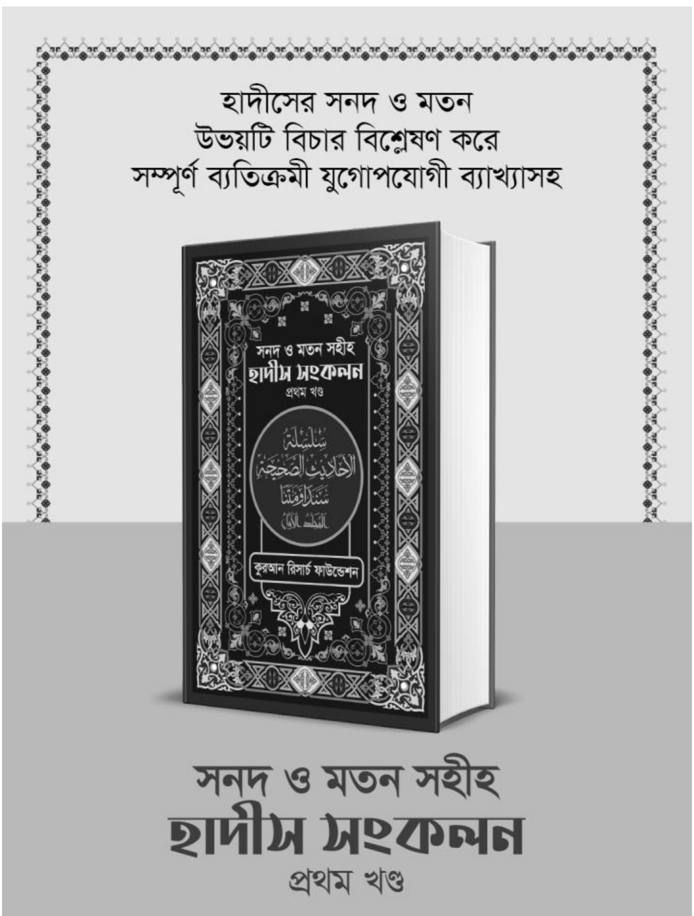

আইন যাচাইয়ের Common sense সম্মত প্রধান মানদণ্ডসমূহ

একটি আইন যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর হবে কি না তা যাচাইয়ের Common sense সম্মত প্রধান মানদণ্ডগুলো মূলগতভাবে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত–

১. আইন প্রণয়নকারী (ব্যক্তি, সত্তা বা সংস্থা) সম্পর্কিত বিষয়।
২. আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী সম্পর্কিত বিষয়।
৩. বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়।

উল্লিখিত তিন শ্রেণির বিষয়ের বিশেষ দিকসমূহের শিরোনাম–

১. আইন প্রণয়নকারীর প্রধান দিকসমূহের শিরোনাম

আইন মানুষের জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল করার ব্যাপারে আইন প্রণয়নকারী ব্যক্তি, সত্তা বা সংস্থা যথাযথ হওয়া সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আইনেই যদি দুর্বলতা থাকে তবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং বিচার ব্যবস্থা যতই মানসম্মত হোক না কেন মানুষের জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল হবে না। তাই আইনকে এ দৃষ্টিকোণ হতে অবশ্যই দুর্বলতা মুক্ত হতে হবে। আর এ জন্য আইন প্রণয়নকারী ব্যক্তি, সত্তা বা সংস্থাকে যে সকল মানদণ্ডের নিরিখে উন্নীত হতে হবে তার প্রধানগুলো হলো–

১.১ আইন প্রণেতার জ্ঞানের বিষয়ভিত্তিক বিস্তৃতি।
১.২ আইন প্রণেতার জ্ঞানের স্থান-কালভিত্তিক বিস্তৃতি।
১.৩ আইন প্রণেতার সংখ্যা।
১.৪ আইন প্রণেতার নিরপেক্ষতা।
১.৫ আইন প্রণেতা ও প্রয়োগকারী সংস্থার শক্তি।
১.৬ আইন প্রণেতার স্থায়িত্ব।
১.৭ আইন প্রণেতা কর্তৃত্বস্থলের বিস্তৃতি।
১.৮ মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিকে প্রণীত আইনের বিস্তৃতি ও তার আনুপাতিক হার।
১.৯ আইন অমান্য করাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করতে পারে এমন কোনো কিছুর অনুমতি প্রণীত আইনে না থাকা।

২. আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর প্রধান দিকসমূহের শিরোনাম

আইন দিয়ে মানুষকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল করতে হলে আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকেও যথাযথ মান ও যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে। এ স্তরের দুর্বলতা কাটাতে হলে আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে যে সকল মানদণ্ডের নিরিখে উন্নীত হতে হবে তার প্রধানগুলো হলো–

২.১ আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং আইন প্রণয়নকারী ব্যক্তি, সত্তা বা সংস্থার মধ্যে সম্পর্ক।

২.২ আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরপেক্ষতা।

৩. বিচার ব্যবস্থার প্রধান দিকসমূহের শিরোনাম

যথাযথ শাস্তি বা পুরস্কারের ব্যবস্থা না থাকলে মানুষ আইন মানতে উৎসাহিত এবং অমান্য করতে নিরুৎসাহিত হয় না। তাই, প্রণীত আইনের যথাযথ সুফল পাওয়ার পথে বিচার ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে সে বিচার ব্যবস্থা হতে হবে নিখুঁত। বিচার ব্যবস্থা নিখুঁত হতে হলে তাকে যে সকল মানদণ্ডের নিরিখে উত্তীর্ণ হতে হবে তার প্রধানগুলো হলো–

৩.১ বিচার দুই স্তরে (প্রাথমিক ও চূড়ান্ত) হওয়া।

৩.২ বিচারক– বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ এবং সব ধরনের প্রভাবমুক্ত হওয়া।

৩.৩ আইন, নিরীক্ষণ পদ্ধতি ও মানা বা না মানার পরিণাম মানুষের জানতে পারার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া।

৩.৪ আইন মানা বা না মানার বিষয়টি নিখুঁতভাবে নিরীক্ষণের (Monitoring) ব্যবস্থা থাকা।

৩.৫ বিচারের সময় জন্মগতভাবে সুযোগ-সুবিধা বেশি বা কম পাওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় আনা।

৩.৬ ওকালতি ও সাক্ষী প্রথার ধরন।

৩.৭ দুনিয়ার বিচারে শাস্তির ধরন।

৩.৮ শাস্তি থেকে কারও রেহাই না পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকা।

৩.৯ পুরস্কারের ধরন।

আইনের যৌক্তিকতা ও কল্যাণকামিতা যাচাইয়ের মানদণ্ডের সাথে সম্পর্কযুক্ত তিন শ্রেণির বিষয়ের প্রধান দিকসমূহের পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত

আমরা এখন আইনের যৌক্তিকতা ও কল্যাণকামিতা যাচাইয়ের মানদণ্ডের সাথে সম্পর্কযুক্ত তিন শ্রেণির বিষয়ের উল্লিখিত বিশেষ দিকসমূহ পর্যালোচনা করার মাধ্যমে জানার চেষ্টা করবো– কুরআনের আইন, না মানব রচিত আইন যৌক্তিক ও কল্যাণকর। বিশেষ দিকসমূহকে আমরা মানদণ্ড হিসেবে উল্লেখ করবো।

মানদণ্ড-১.১

আইন প্রণয়নকারীর জ্ঞানের বিষয়ভিত্তিক (Subjective) বিস্তৃতি

যে ব্যক্তি, সত্তা বা সংস্থা মানুষের জন্য আইন প্রণয়ন করবে তাকে নিম্নের দুটি বিষয়ের পরিপূর্ণ এবং নিখুঁত প্রাকৃতিক জ্ঞান থাকতে হবে–

ক. মানুষ সম্পর্কিত প্রাকৃতিক জ্ঞান

এ জ্ঞানে অন্তর্ভুক্ত হবে– মানুষের ভ্রূণবিদ্যা (Embryology), অঙ্গব্যবচ্ছেদ বিদ্যা (Anatomy), শরীরবৃত্ত (Physiology), মনোবিদ্যা (Psychology), বুদ্ধিবৃত্তি (Intellectuality), যৌনবিদ্যা (Sexology), আচার-আচরণ (Behavior), প্রয়োজন (Need), বয়োবৃদ্ধতা (Aging process), খাদ্য-খাবার (Food), রোগ (Disease), চিকিৎসা (Treatment), সীমাবধ্যতা (Limitations) ইত্যাদি সকল বিষয় সম্পর্কিত প্রাকৃতিক জ্ঞান।

খ. মানুষের শরীরের বাইরের বিশ্ব সম্পর্কিত প্রাকৃতিক জ্ঞান

এ জ্ঞানে অন্তর্ভুক্ত হবে– পৃথিবী ও মহাকাশের যা কিছু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের কাজে লাগে বা মানুষকে প্রভাবিত করে তার সকল কিছুর প্রাকৃতিক জ্ঞান। অর্থাৎ পৃথিবী ও মহাকাশ সম্পর্কিত সকল প্রাকৃতিক জ্ঞান।

যে সত্তার উপরোক্ত বিষয়সমূহে পরিপূর্ণ ও নিখুঁত জ্ঞান নেই, তিনি কখনই মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, স্বাস্থ্য, দেশ পরিচালনা এবং মহাবিশ্বের সকল বস্তুর ব্যবহার করা বা না করা নিয়ে এমন কোনো আইন বানাতে পারবেন না, যা মানুষের জন্য সার্বিকভাবে কল্যাণকর হবে।

আলোচ্য মানদণ্ডের নিরিখে মানব রচিত আইন ও কুরআনের আইনের অবস্থান পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত–

মানব রচিত আইন

মানব সমাজের কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার (পার্লামেন্ট, লোকসভা, সিনেট ইত্যাদি) উপরোক্ত সকল বিষয়ে নির্ভুল ও পরিপূর্ণ প্রাকৃতিক জ্ঞান থাকা অসম্ভব। আর পৃথিবীর কেউ তা দাবিও করে না। এ জন্যই–

১. বিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে মানুষের আবিষ্কৃত অসংখ্য তত্ত্ব (Theory) কিছু দিন পর পর পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখা যায়।
২. সমাজ বা রাষ্ট্র শাসনে মানুষের তৈরি বিভিন্ন আইনকেও কিছু দিন পর পর পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখা যায়। আর এটি পৃথিবীর সকল দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ফল্যে একই দেশের মানুষ যেমন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইন দিয়ে শাসিত হয়, তেমনি বিভিন্ন দেশের মানুষ বিভিন্ন আইন দিয়ে শাসিত হয়। এটি কোনো মতেই যুক্তিসংগত নয়। কারণ একই কাজ করে একটি দেশের বিভিন্ন সময়ের মানুষ বা বিভিন্ন দেশের মানুষ বিভিন্নভাবে পুরস্কার (শান্তি) বা শাস্তি (কষ্ট) প্রাপ্ত হবে, এটি যুক্তিসংগত নয়।

আর মানুষের জ্ঞান কত স্বল্প তা অসংখ্য উদাহরণের ভিত্তিতে প্রমাণ করা যায়। ঐ উদাহরণের একটি হলো চিকিৎসা বিজ্ঞান। বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞান উন্নতির চরম শিখরে। সেই চিকিৎসা বিজ্ঞান এখনও অধিকাংশ মানব রোগের প্রকৃত কারণ (Etiology) জানে না।

কুরআনের আইন

জ্ঞানের বিষয়ভিত্তিক বিস্তৃতির ব্যাপারে কুরআনের আইনের প্রণেতার অবস্থান কোথায় তা তিনি অসংখ্যবার নানা ধরনের বক্তব্যের মাধ্যমে আল কুরআনে জানিয়ে দিয়েছেন। সে বক্তব্যের দুটি নিম্নরূপ–

তথ্য-১

... ... وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ .

অনুবাদ : ... ... মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তার সবই আল্লাহ (কুরআনের আইনের প্রণেতা) জানেন। (আর) সকল বিষয় সম্বন্ধে তাঁর (পরিপূর্ণ) জ্ঞান আছে।

(সুরা হুজরাত/৪৯ : ১৬)

তথ্য-২

... ... وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

অনুবাদ : ... ... আল্লাহ উদারহস্ত এবং সর্বঅভিজ্ঞ।

(সুরা বাকারা/২ : ২৬১)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : কুরাআনের আইনের প্রণেতার সকল বিষয়ের জ্ঞান আছে বা তিনি সর্বঅভিজ্ঞ কথাটির অর্থ হচ্ছে– তিনি মানুষের শরীর এবং মহাকাশ ও পৃথিবীর সকল কিছুর নিখুঁত প্রাকৃতিক জ্ঞান রাখেন। এ বিষয়ে আরও অসংখ্য আয়াত আল কুরআনে আছে।

কুরআনের আইন প্রণেতার মানুষের শরীর ও শরীরের বাইরের পৃথিবীর নিখুঁত জ্ঞান থাকার প্রমাণ–

ক. মানব শরীরের নিখুঁত জ্ঞান থাকার প্রমাণ

এ বিষয়ের দুটি প্রমাণ হলো–

প্রমাণ-১

❖ **মানব ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর :** মানব ভ্রূণ বৃদ্ধির স্তর বিন্যাস সম্পর্কে যে তথ্য বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আয়ত্তে এসেছে তা হলো–

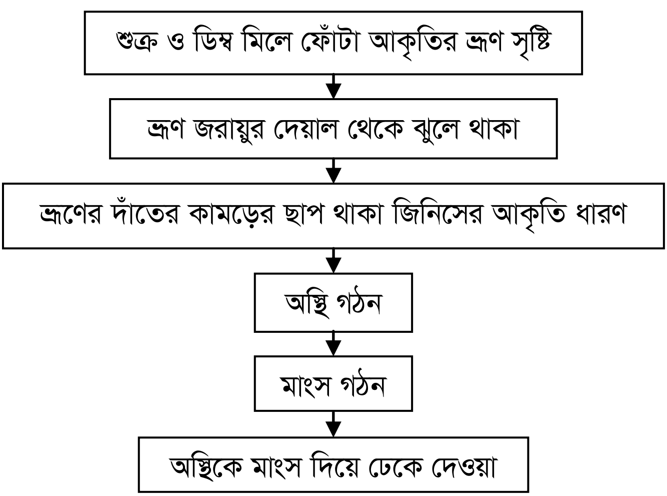

চিত্র-১ : শুক্র (Sperm) ও ডিম্ব (Ovum)

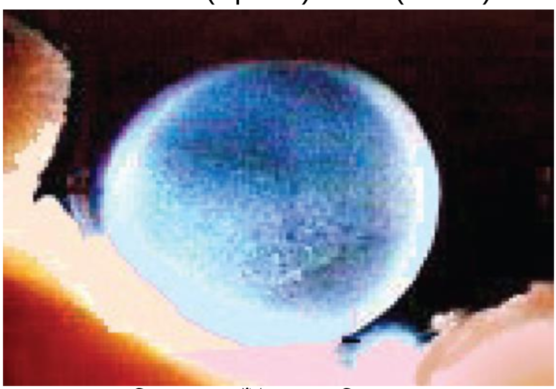

চিত্র-২ : ফোঁটা আকৃতির ভ্রূণ

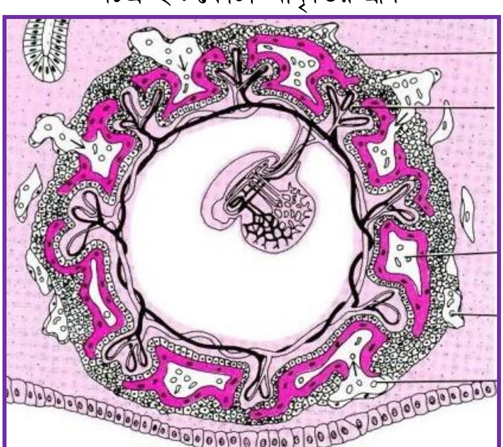

চিত্র-৩ : ঝুলে থাকা আকৃতির ভ্রূণ (আলাকা)

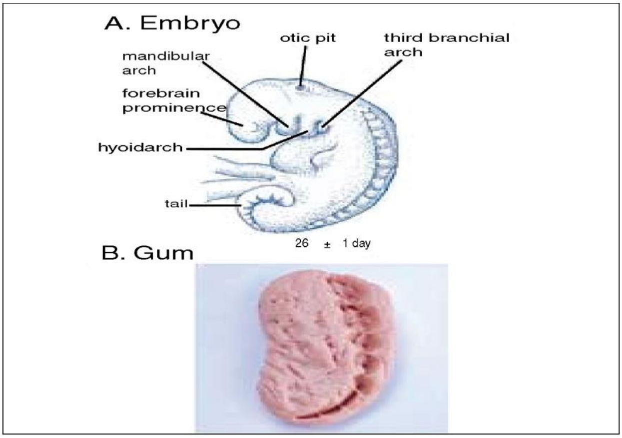

চিত্র-৪ : নরম জিনিসে দাঁতের ছাপ থাকা আকৃতির ভ্রূণ (মুদগাহ)

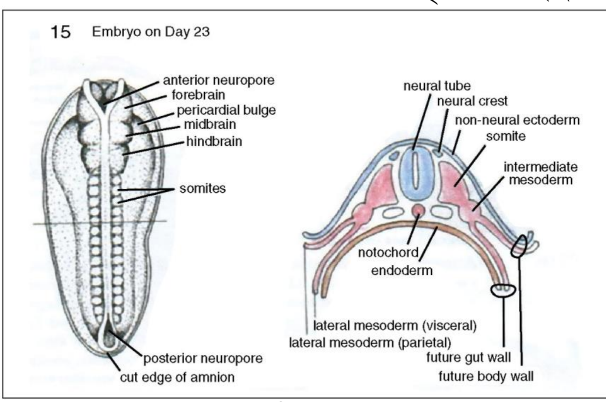

চিত্র-৫

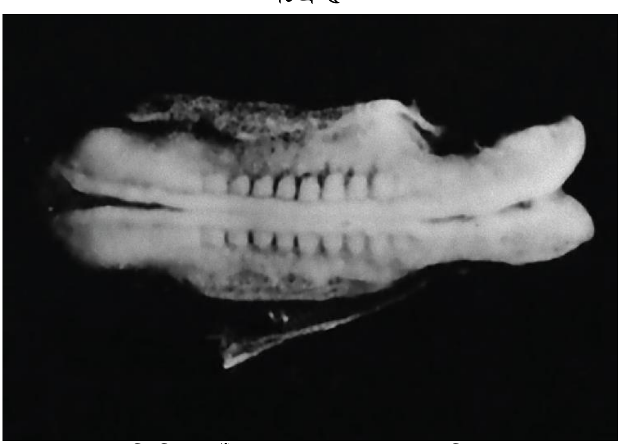

চিত্র-৬ : নরম জিনিসে দাঁতের ছাপ থাকা আকৃতির ভ্রূণ (মুদগাহ)

চিকিৎসা বিজ্ঞান এ তথ্যগুলো জানতে পেরেছে মাত্র কয়েক বছর পূর্বে। আর তা জানা গেছে মাইক্রোসকোপ, আল্টাসোনোগ্রাফি, সিটি স্ক্যান, এম.আর. আই ইত্যাদি আবিস্কার হওয়ার পর। ঐ যন্ত্রসমূহ আবিস্কারের সন হলো– মাইক্রোসকোপ : **১৫৯০**, আল্টাসোনোগ্রাফি : **১৯৭২**, সিটি স্ক্যান : **১৯৭৭**, এম.আর.আই : **১৯৭৭**।

এ বিষয়ে প্রায় ১৫০০ বছর আগে নাযিল হওয়া কুরআনের তথ্য–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ . ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ . ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ... ...

অনুবাদ : আমি মানুষকে মাটির মৌলিক উপাদান থেকে তৈরি করেছি। পরে তাকে **ফোঁটায়** পরিবর্তিত করে এক সংরক্ষিত স্থানে স্থাপন করা হয়। তারপর সে ফোঁটাকে **আলাকে** (ঝুলে থাকা বস্তু) পরিণত করা হয়। অতঃপর তাকে **মুদগার** (নরম জিনিসে দাঁতের কামড়ের ছাপ থাকা বস্তু) আকৃতি দেওয়া হয়। এরপর **অস্থি** সৃষ্টি করা হয়। পরে সে অস্থিকে **মাংস** দিয়ে আচ্ছাদিত করা হয়।
(সুরা মু'মিনুন/২৩ : ১২-১৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতগুলোর ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– মায়ের পেটে ভ্রূণের স্তর বিন্যাস বিষয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান এখন যা আবিষ্কার করেছে কুরআন ১৫০০ বছর আগে অভিন্ন কথাই বলেছে।

প্রমাণ-২

❖ **মানুষের শরীরে Common sense/আকল, স্নেহ, শ্রদ্ধা, মমতা, প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, গর্ব, অহংকার, হিংসা, ঘৃণা ইত্যাদি থাকার স্থান :** জ্ঞানের শক্তি Common sense, স্নেহ, শ্রদ্ধা, মমতা, প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, গর্ব, অহংকার, হিংসা, ঘৃণা ইত্যাদি থাকে মানুষের মনে (Mind/অন্তর)। আরবীতে মনকে বলা হয় 'ক্বলব' (قَلْبٌ)। মানুষের শরীরে মনের অবস্থান সম্পর্কে বর্তমান সময়েও অধিকাংশ সাধারণ (চিকিৎসক নন) মানুষের ধারণা হলো– মন থাকে বক্ষের বাম পাশে থাকা হৃৎপিণ্ডে (Heart/হৃদয়)।

তাইতো যিক্‌রের মাধ্যমে 'ক্বলব' পরিষ্কার করার বিষয়টিকে বুকের বাম দিকে থাকা হার্ট/ হৃৎপিণ্ড পরিষ্কার করা অর্থে ধরা ও চালু করা হয়েছে।

আর সাধারণ জ্ঞানে মনের ব্যাথাকে প্রকাশ করা হয় তীরবিদ্ধ হার্টের ছবির মাধ্যমে। ছবি দেখুন–

চিত্র-৭

বর্তমান যুগের চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য হলো– বুকের বাম দিকে থাকা হার্টের (Heart) একমাত্র কাজ হলো রক্ত পাম্প করা। ছবি দেখুন–

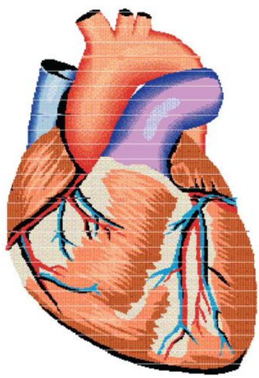

চিত্র-৮

অন্যদিকে বর্তমান যুগের চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অনুযায়ী, মানব শরীরে মনের (Mind/অন্তর) অবস্থান হলো মাথায় থাকা ব্রেইন। ছবি দেখুন–

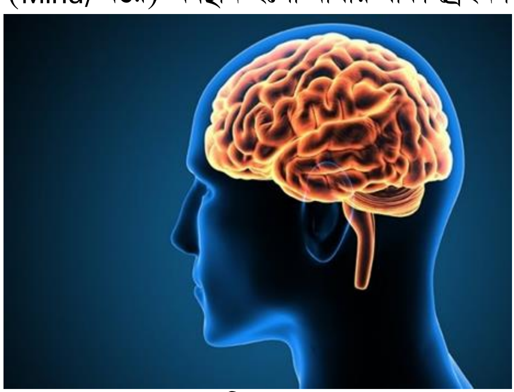

চিত্র-৯

চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুযায়ী মানব ব্রেইন তিন অংশে বিভক্ত–

১. সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain)
২. মধ্য ব্রেইন (Mid brain)
৩. পশ্চাৎ ব্রেইন (Hind brain)

এবং ব্রেইন ডান ও বাম দুটি সমান ভাগে বিভক্ত থাকে। ছবি দেখুন–

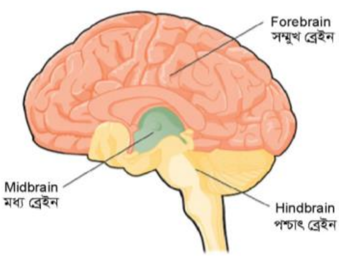

চিত্র-১০

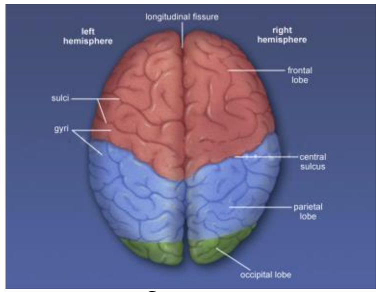

চিত্র-১১

সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত–

১. Frontal lobe
২. Parietal lobe
৩. Temporal lobe
৪. Occipital lobe

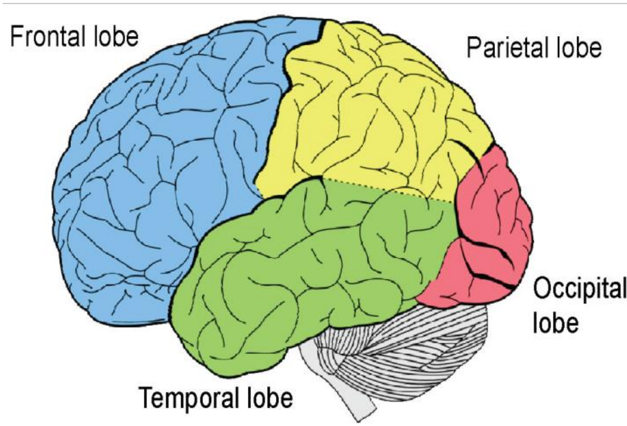

চিত্র-১২

মন (Mind) নামক বস্তুগত অস্তিত্বহীন (Vertual) আধারটি সৃষ্টিগত/ জন্মগতভাবে যে সকল শক্তি/ক্ষমতা ধারণ করে তা হলো–

১. জ্ঞানের শক্তি (আকল/বিবেক/Common sense)

২. চিন্তাশক্তি (Thinking power)
৩. বিশ্লেষণ শক্তি (Analytic power)
৪. কার্যনির্বাহি শক্তি (Working power)
৫. পরিকল্পনা শক্তি (Planning power)
৬. সমস্যা সমাধান শক্তি (Problem solving power)
৭. সাংগঠনিক শক্তি (Organising power)
৮. আচরণ নিয়ন্ত্রন শক্তি (Behavior controlling power)
৯. স্মরণশক্তি (Memmory)
১০. বুঝের শক্তি (Understanding power)
১১. ভাষা শক্তি (Languistic power)
১২. দৃষ্টিভঙ্গিমূলক শক্তি (Atitude)
১৩. শব্দ গঠন শক্তি (Sentense making power)
১৪. গাণিতিক শক্তি (Mathmatical power)
১৫. বানান শক্তি (Spelling power)
১৬. আচার-আচরণমূলক শক্তি (Custom & Conductual power) (ব্যক্তিত্ব (Personality), স্নেহ, মমতা (Affection), ভালোবাসা (Love), হিংসা (Jealousy), ক্রোধ (Anger), অহংকার (Pride) ইত্যাদি)।

আধারটির শক্তির বিষয়গুলো সৃষ্টিগতভাবে বিভক্ত হয়ে সম্মুখ ব্রেইনের বিভিন্ন অংশে নিম্নভাবে অবস্থিত–

ক. সম্মুখ ব্রেইনের অগ্রভাগে (Frontal lobe) থাকা বিষয়সমূহ

১. জ্ঞানের শক্তি (আকল/বিবেক/Common sense)
২. চিন্তাশক্তি (Thinking power)
৩. বিশ্লেষণ শক্তি (Analytic power)
৪. কার্যনির্বাহি শক্তি (Working power)
৫. পরিকল্পনা শক্তি (Planning power)
৬. সমস্যা সমাধান শক্তি (Problem solving power)
৭. সাংগঠনিক শক্তি (Organising power)
৮. আচরণ নিয়ন্ত্রন শক্তি (Behavior controllin power
৯. আচার-আচরণমূলক শক্তি (Custom & Conductual power) (ব্যক্তিত্ব (Personality), স্নেহ, মমতা (Affection), ভালোবাসা (Love), হিংসা (Jealousy), ক্রোধ (Anger), অহংকার (Pride) ইত্যাদি)।

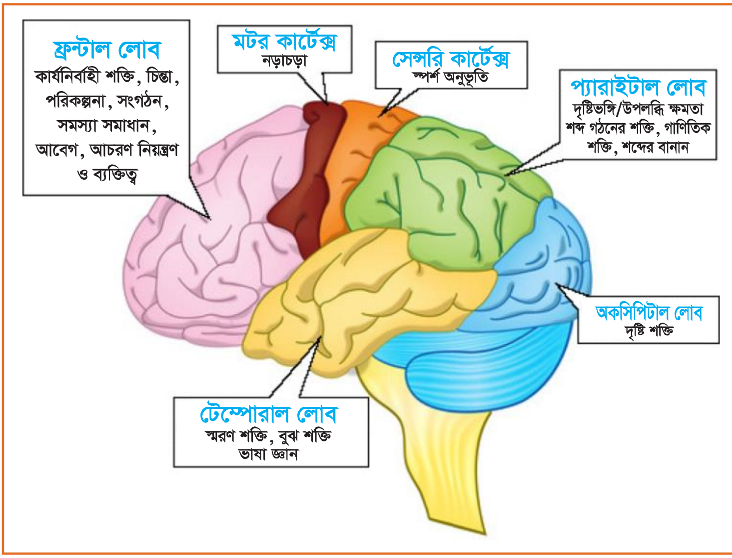

চিত্র-১৩

সম্মুখ ব্রেইনের (Fore brain) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান হলো সামনের অংশটি (Frontal lobe)। এটি মানুষের মাথার সামনের দিকে তথা কপালের পেছনে থাকে।

খ. সম্মুখ ব্রেইনের Parietal lobe-এ থাকা বিষয়সমূহ

১. দৃষ্টিভঙ্গিমূলক শক্তি (Atitude)
২. শব্দ গঠন শক্তি (Sentense making power)
৩. গাণিতিক শক্তি (Mathmatical power)
৪. বানান শক্তি (Spelling power)

গ. সম্মুখ ব্রেইনের Temporal lobe-এ থাকা বিষয়সমূহ

১. স্মরণশক্তি (Memmory)
২. বুঝের শক্তি (Understanding power)
৩. ভাষা শক্তি (Languistic power)

আল কুরআনেও মানব শরীরে মনের অবস্থান সম্পর্কে ওপরে বর্ণিত অভিন্ন তথ্য আছে। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানের তথ্য জানা না থাকার কারণে কুরআনের তরজমা ও তাফসীরে সঠিক অর্থটি আসেনি। মন শরীরের কোন স্থানে আছে তা কুরআন বিভিন্ন স্থানে যথার্থভাবে উল্লেখ করা আছে। তবে নিম্নের আয়াতটি থেকে বিষয়টি সবচেয়ে ভালোভাবে জানা যায়-

.... فَاِنَّهَا لَا تَعۡمَی الۡاَبۡصَارُ وَلٰکِنۡ تَعۡمَی الۡقُلُوۡبُ الَّتِیۡ فِی الصُّدُوۡرِ .

অনুবাদ ('ক্বলব' ও 'সদর' শব্দ দুটি অপরিবর্তিত রেখে) : প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে ক্বলব যা আছে সদরে। (সুরা হাজ্জ/২২ : ৪৬)

আয়াতটির প্রচলিত অর্থ : প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন যা আছে বক্ষে (বক্ষে অবস্থিত হৃৎপিণ্ডে)।

প্রচলিত অর্থের পর্যালোচনা : আয়াতটির প্রচলিত অর্থের তথ্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত/নির্ভুল তথ্যের শতভাগ বিপরীত। তাই এটি অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ, সুরা হা-মিম-আস-সিজদার ৫৩ নং আয়াতের মাধ্যমে (পরে আসছে) জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত/নির্ভুল তথ্য এবং কুরআনের ঐ বিষয়ের তথ্য অভিন্ন।

আয়াতটির প্রকৃত অর্থ : কুরআন ও হাদীসে قَلۡبٌ (ক্বলব) শব্দটি বহুবার এসেছে। শব্দটির আভিধানিক মূল ও উৎপত্তিগত অনেক অর্থের প্রধান দুটি হলো–

১. Heart (হৃৎপিণ্ড), যা বুকের বাম দিকে থাকে।

২. মন (অন্তর/Mind)।

صَدۡرٌ (সদর) শব্দটিও আল কুরআন ও হাদীসে বহুবার এসেছে। صَدۡرٌ (সদর) শব্দের আভিধানিক মূল ও উৎপত্তিগত অনেক অর্থের প্রধান দুটি হলো–

১. বক্ষ।

২. সম্মুখ ভাগ।

প্রচলিত সাধারণ জ্ঞান (চিকিৎসা বিজ্ঞান ভিন্ন জ্ঞান) মতে– হার্ট (হৃৎপিণ্ড), অন্তর ও মনকে একই জিনিসের প্রতিশব্দ মনে করা হয় এবং আরবী 'ক্বলব' শব্দটির অর্থে প্রতিশব্দ হিসেবে ঐ তিনটি বিষয়কে ব্যবহার করা হয়। আর তাই 'ক্বলব'-এর অবস্থান ধরা হয় বুকের বাম দিকে। আর মনে করা হয়- বুকের বাম দিকে থাকা হার্ট (হৃৎপিণ্ড), অন্তর বা মনে আছে জ্ঞান, স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা ইত্যাদি। প্রায় সকল তাফসীরকারক 'ক্বলব' শব্দটির অর্থ ও শারীরিক অবস্থান প্রচলিত সাধারণ জ্ঞানের অনুরূপ ধরেছেন।

প্রকৃত অনুবাদ (قَلۡبٌ শব্দটির অনুবাদ মন এবং صَدۡرٌ শব্দটির অনুবাদ সম্মুখ অংশ ধরে) : প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন, যা অবস্থিত সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)।

এ অনুবাদ চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত/নির্ভুল তথ্যের সাথে শতভাগ সংগতিশীল। তাই এটি গ্রহণযোগ্য হবে।

♣♣ এ দুটি উদাহরণসহ কুরআনে বর্ণিত চিকিৎসা বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞানের অনেক তথ্যের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে– মানুষ সম্পর্কে নিখুঁত প্রাকৃতিক জ্ঞান শুধুমাত্র কুরআনের আইনের প্রণেতারই আছে ।

খ. মানব শরীরের বাইরের পৃথিবীর নিখুঁত জ্ঞান থাকার প্রমাণ

কুরআনের আইন প্রণেতার পৃথিবী ও মহাকাশের সকল কিছু সম্বন্ধে নিখুঁত প্রাকৃতিক জ্ঞান আছে তা সহজে বুঝা যায়, কুরআনে থাকা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কিত আয়াতের বক্তব্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত/সঠিক তথ্য মেলালে।

আর বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তথ্য যদি সঠিক হয় তবে সেটি ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্যের সাথে মিলে যাবে কথাটি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ... ...

অনুবাদ : শীঘ্র আমরা দিগন্ত এবং তাদের নিজেদের শরীরের মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়) তাদেরকে দেখাতে থাকবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য। ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর সুরা আলে ইমরানের ৭ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা তিনি ছাড়া কেউ জানেন না।

তাই খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হতে থাকবে।

তাই আয়াতটি অনুযায়ী– মানুষের শরীরের বাইরের ও ভেতরের বিষয় নিয়ে যত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হবে কুরআন তত সত্য প্রমাণিত হবে। আর ঐ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে।

এ আয়াতের বক্তব্য সত্য হওয়ার মানব শরীর সম্পর্কিত দুটি তথ্য আমরা ওপরে উল্লেখ করেছি। আর আয়াতটির বক্তব্য সত্য হওয়ার বিষয়ে মানব শরীরের ও মহাবিশ্বের অনেক প্রমাণ বর্তমানে আছে। যেমন– ভিডিও

ক্যামেরা, আণবিক শক্তি, যুদ্ধবিমান, পৃথিবী ও মহাকাশের সৃষ্টি, মদের অপকারিতা ইত্যাদি।

বিষয়টি নিয়ে আলোচনা আছে **'ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?'** (গবেষণা সিরিজ-১৩) নামক বইটিতে।

♣♣ সুতরাং নিশ্চিতভাবে বলা যায়– জ্ঞানের বিষয়ভিত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআনের আইন যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর কিন্তু মানুষের আইন তা নয়। অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ভিত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– কুরআনের আইন বিশ্বের সকল দেশের মানুষকে জীবনের সকল বিষয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিপূর্ণ শান্তি দিতে পারবে। কিন্তু মানব রচিত আইন তা কখনই পারবে না।

মানদণ্ড-১.২
আইন প্রণয়নকারীর জ্ঞানের স্থান-কালভিত্তিক বিস্তৃতি

আইন প্রণয়নকারীর (ব্যক্তি, সত্তা বা সংস্থা) পূর্বোল্লিখিত সকল বিষয়ের তিন কালের (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ) জ্ঞান থাকতে হবে। অর্থাৎ প্রতিটি বিষয়ের অতীতে কী অবস্থা ছিল, বর্তমানে কী অবস্থা আছে এবং ভবিষ্যতে কী অবস্থা হবে তার পরিপূর্ণ ও নিখুঁত জ্ঞান থাকতে হবে। এ ব্যাপারে আইন প্রণেতার দুর্বলতা থাকলে তার বানানো আইন কিছু দিন পর পর পরিবর্তিত হয়ে যেতে বাধ্য।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের পর্যালোচনা–

মানব রচিত আইন

মানব সমাজের কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার পক্ষে সকল বিষয়ের জ্ঞান থাকাতো দূরের কথা একটি বিষয়েরও তিন কালের পরিপূর্ণ ও নিখুঁত জ্ঞান থাকা সম্ভব নয়। তাই তার পক্ষে কোনো বিষয়ে এমন কোনো আইন বানানো সম্ভব নয় যা চিরকাল চলবে। মানুষের আইন প্রণেতার এ দুর্বলতার জন্যও বিভিন্ন সময়ের মানুষ বিভিন্ন আইন দিয়ে শাসিত হবে বা হয়। এটি যুক্তিসংগত নয়।

কুরআনের আইন

জ্ঞানের স্থান-কালের বিস্তৃতির ব্যাপারে কুরআনের আইন প্রণেতার অবস্থান কোথায় তা তিনি কুরআনে বহুবার জানিয়েছেন। ঐ ধরনের দুটি বক্তব্য এখানে উল্লেখ করা হলো–

তথ্য-১

... ... يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ... ...

অনুবাদ : ... ... (কুরআনের আইনের প্রণেতা) তাদের সম্মুখের (বর্তমান ও ভবিষ্যতের) ও পিছনের সকল কিছুই জানেন। ... ...

(সুরা বাকারা/২ : ২৫৫)

ব্যাখ্যা : এ ধরনের বক্তব্য সম্বলিত অনেক আয়াত কুরআনে আছে। এ সকল আয়াতের মাধ্যমে কুরআনের আইনের প্রণেতা ঘোষণা দিয়েছেন যে, তিনি মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল কিছুই জানেন। অর্থাৎ তাঁর তিন কালের জ্ঞান আছে।

তথ্য-২

পূর্বে উল্লিখিত সুরা হা-মিম-আস-সিজদার ৫৩ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে মানুষ, পৃথিবী ও মহাকাশ সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় আবিষ্কৃত হতে থাকবে। আর ঐ আবিষ্কার যদি সঠিক হয় তবে তা কুরআনের ঐ বিষয়ের বক্তব্যের সাথে মিলে যাবে। এ কথা যে সঠিক তা কিছু দিন পরপরই মানব সভ্যতা বাস্তবে দেখতে পাচ্ছে।

♣♣ তাই কুরআনের আইনের প্রণেতা মহান আল্লাহর পক্ষেই শুধু সম্ভব সকল জিনিসের তিন কালের জ্ঞান পর্যালোচনা করে এমন আইন বানানো, যা দিয়ে সকল কালের মানুষ সমান ও নিরবচ্ছিন্নভাবে কল্যাণপ্রাপ্ত হবে। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকেও মানব রচিত আইন কোনোভাবেই যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর নয়। পক্ষান্তরে কুরআনের আইন সম্পূর্ণ যৌক্তিক ও কল্যাণকর।

মানদণ্ড-১.৩
আইন প্রণয়নকারীর সংখ্যা

আইন প্রণেতা একক সত্তা হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ স্বাধীন চিন্তাধারা সম্বলিত বিভিন্ন সত্তা যদি আইন বানাতে বসে, তবে সবাই সম্পূর্ণ একমত হয়ে সকল আইন কখনই তৈরি করতে পারবে না। আর যদি বেশির ভাগ সত্তার মত অনুযায়ী কোনো আইন বানানো হয়, তবে যারা ঐ আইনের পক্ষে নয় তারা শতভাগ আন্তরিকতা সহকারে ঐ আইন বাস্তবায়নের জন্য কাজ করবে না। অথবা তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঐ আইনের বিপক্ষে কাজ করবে। এ অবস্থা যদি কোনো মৌলিক আইনের ব্যাপারে হয়, তবে তা দিয়ে মানুষের জীবন অশান্তিময় হতে বাধ্য।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থান–

মানব রচিত আইন

মানব রচিত আইন প্রণেতারা (পার্লামেন্ট, সিনেট, আইন পরিষদ সদস্য ইত্যাদি) একের অধিক দল ও সংখ্যার হয় এবং তাদের সকলেরই স্বাধীন চিন্তাধারা ও কিছু না কিছু ক্ষমতা থাকে। তাই কোনো দেশের সকল আইন প্রণেতা শতভাগ একমত হয়ে ঐ দেশের আইন প্রণয়ন করেছে এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। ফলস্বরূপ দেখা যায়– অনেক মৌলিক আইনের বাস্তবায়নের ব্যাপারেও বিরোধী সদস্যরা নানা ধরনের অসহযোগিতা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এটি মানব রচিত আইনের নিরবচ্ছিন্ন ও পরিপূর্ণ শান্তি দেওয়ার পথে একটি বিরাট বাধা।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনের প্রণেতা তাঁর আইন প্রণয়নকারী সদস্যদের সংখ্যার ব্যাপারে বলেছেন–

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ .

অনুবাদ : বলে দাও, তিনি আল্লাহ এক এবং একক।

(সুরা ইখলাস/১১২ : ১)

ব্যাখ্যা : কুরআনের আইনের প্রণেতা এখানে দ্ব্যর্থহীনভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি এক এবং একক। অর্থাৎ আইন বানানো, সিদ্ধান্ত নেওয়া ইত্যাদি সকল ব্যাপারে তিনি একক। অন্য কারো এ বিষয়ে অংশীদারিত্ব নেই।

... ... اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ ... ...

অনুবাদ : আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হুকুম দেওয়ার ক্ষমতা নেই।

(সুরা ইউসুফ/১২ : ৪০)

ব্যাখ্যা : যেটি হুকুম সেটিই আইন। আবার যেটি আইন সেটিই হুকুম। তাই কুরআনের আইনের প্রণেতা এখানে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, আইন বানানোর সার্বভৌম ক্ষমতা শুধু তাঁরই। অর্থাৎ তিনি একাই সব আইন তৈরি করেন। কারণ, মানুষের জন্য সার্বিকভাবে কল্যাণকর হবে এমন আইন বানানোর জন্য বিভিন্ন বিষয়ের প্রয়োজনীয় নিখুঁত জ্ঞান শুধু তাঁরই আছে। ঐ জ্ঞান ব্যবহার করে তিনি মানুষের জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলভাবে পরিচালনার জন্য দরকারি সকল আইন প্রণয়ন করেছেন। অতঃপর সে আইন কুরআন ও সুন্নাহের মাধ্যমে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। আর সে আইন বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য একজন প্রতিনিধিও (মুহাম্মাদ স.) পাঠিয়েছেন। তিনি নিখুঁতভাবে ঐ আইন বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েও দিয়ে

গেছেন। আর কুরআনে তিনি নির্ভুলভাবে উল্লেখ করে রেখেছেন, মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সকল মৌলিক আইন। এ তথ্যটি তিনি জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

... ... وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ... ...

অনুবাদ : আর আমরা তোমার প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছি তাতে রয়েছে সকল (মৌলিক) বিষয়ের স্পষ্ট বিবরণ।

(সুরা আন নাহল/১৬ : ৮৯)

... ...مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ ... ...

অনুবাদ : আমি আল কুরআনে (মৌলিক) কোনো কিছু উল্লেখ করতে বাদ রাখিনি।

(সুরা আন'আম/৬ : ৩৮)

কুরআনের আইনে অন্য ব্যক্তি বা সংস্থার আইন বানানোর ব্যাপারে যে অধিকার দেওয়া হয়েছে তা হলো– যে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নায় স্পষ্ট আইন নেই, সে সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহের অন্যান্য আইনের আলোকে তারা আইন বানাতে পারবে। ঐ সকল বিষয় হচ্ছে অমৌলিক বা ছোটোখাটো বিষয়। আর আইন তৈরির ব্যাপারে এ ক্ষমতাটুকু আল্লাহ এ জন্য ছেড়ে দিয়েছেন যে, ঐ ধরনের আইনে যদি কিছু ভুলও থাকে, তবে তাতে মানুষের জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল হওয়ার পথে বড়ো কোনো বাধা সৃষ্টি করবে না।

♣♣ তাহলে দেখা যাচ্ছে আইন প্রণেতার সংখ্যার মানদণ্ডের দিক দিয়ে কুরআনের আইন যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর কিন্তু মানব রচিত আইন তা মোটেই নয়।

মানদণ্ড-১.৪
আইন প্রণয়নকারীর নিরপেক্ষতা

প্রণীত আইন সবার জন্য সমানভাবে কল্যাণকর হতে হলে আইন প্রণেতাকে সকল দৃষ্টিকোণ থেকে শতভাগ ন্যায়ের পক্ষে হতে হবে। অর্থাৎ তাকে লিঙ্গ, বংশ, গোত্র, রং, শ্রেণি, দল ও দেশের পরিচয়ের ঊর্ধ্বে হতে হবে। তা না হলে যে লিঙ্গ, বংশ, গোত্র, রং, শ্রেণি, দল বা দেশে আইন প্রণেতার অবস্থান, মনের অজান্তে আইন বানানোর সময় তার প্রতি কিছু পক্ষপাতিত্ব হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক হবে।

এ দৃষ্টিকোণের আলোকে উভয় আইনের অবস্থান–

মানব রচিত আইন

মানব রচিত আইনের প্রণেতা একজন মানুষ বা অনেক মানুষের সমন্বয়ে গঠিত কোনো সংস্থা। মানুষ কোনো না কোনো লিঙ্গ, বংশ, গোত্র, রং, শ্রেণি, দল বা দেশের অবশ্যই নাগরিক। তাই, মানুষের মাধ্যমে তৈরি আইন কখনই ঐ সকল দৃষ্টিকোণ থেকে শতভাগ নিরপেক্ষ হতে পারে না। তাইতো দেখা যায়–

১. ধনিক শ্রেণির তৈরি আইন ধনীদের জন্য যেমন কল্যাণকর, গরিবদের জন্য তেমন নয়।
২. বঞ্চিত শ্রেণির তৈরি আইন (সমাজতান্ত্রিক আইন) ধনীদের জন্য সমানভাবে কল্যাণকর নয়।
৩. এক দেশের লোকদের বানানো আইন অন্য দেশের লোকদের জন্য ক্ষতিকর।
৪. সাদা রঙের মানুষের তৈরি আইন, কালো রঙের মানুষের জন্য সমানভাবে কল্যাণকর নয়।
৫. রাজবংশের তৈরি আইনে রাজবংশের সদস্য এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে কিছু ব্যবধান থাকেই।
৬. পুরুষের তৈরি আইন নারীদের জন্য সমানভাবে কল্যাণকর নয় এবং নারীরা আইন তৈরি করলেও তা পুরুষের প্রতি সমান কল্যাণকর হবে না।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনের প্রণেতা তাঁর বংশ পরিচয় সম্পর্কে যে ঘোষণা দিয়েছেন–

لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ .

অনুবাদ : তাঁর কোনো সন্তান নেই এবং তিনি কারও সন্তানও নন।

(সুরা ইখলাস/১১২ : ৩)

ব্যাখ্যা : কুরআনের আইনের প্রণেতা এখানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন– তিনি কারো মা-বাবা নন বা তাঁরও কোনো মা-বাবা নেই। অর্থাৎ তিনি জানিয়ে দিয়েছেন– বংশ, গোত্র বা আত্মীয়তার দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি সম্পূর্ণ ন্যায়ের পক্ষে। আর যেহেতু তিনি কোথাও জন্মাননি তাই জন্মগতভাবে তিনি কোনো দেশের নাগরিকও নন। তিনি যেহেতু কারো থেকে জন্ম নেননি বা কাউকে জন্মও দেননি, তাই তিনি পুরুষ ও মহিলা কোনটিই নন।

... ... وَّهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ؕ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۚ ... ...

অনুবাদ : ... ... তিনিই সব কিছুর রব; আর প্রত্যেক ব্যক্তি (তা থেকে) কিছুই অর্জন করে না যা তার ওপর বর্তায় না (প্রত্যেকে স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী)। আর কেউ অন্যের বোঝা বহন করবে না।

(সুরা আনআম/৬ : ১৬৪)

ব্যাখ্যা : রব শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। একটি অর্থ হচ্ছে কল্যাণ কামনাকারী। কুরআনের আইনের প্রণেতা তাই এখানে প্রথমে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন (লিঙ্গ, বংশ, গোত্র, রং, শ্রেণি, দল ও দেশের পরিচয়ের ঊর্ধ্বে থেকে) তিনি সকল মানুষের জন্য সমানভাবে কল্যাণকামী। এরপর তিনি তাঁর এই সমানভাবে কল্যাণ কামনার দুটো দিক ব্যাখ্যা করেছেন। সে দিক দুটো হলো–

১. একজন মানুষ নিজে যা অর্জন করেছে তা ছাড়া অন্যকিছু তার ওপর তিনি চাপান না।
২. একজনের কৃতকর্মের বোঝা তিনি অন্যের ওপর চাপান না।

♣♣ তাই আইন প্রণেতার নিরপেক্ষতার দৃষ্টিকোণ থেকেও নিঃসন্দেহে বলা যায়, কুরআনের আইন সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর কিন্তু মানব রচিত আইন তা নয়।

মানদণ্ড-১.৫

আইন প্রণয়নকারী ও প্রয়োগকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শক্তি

আইন প্রণয়নকারী ও প্রয়োগকারী সত্তার শক্তি হতে হবে পৃথিবীর সকল মানুষের সম্মিলিত শক্তির চেয়েও অধিক। তা না হলে একটি আইন যদি কোনো এলাকা, দেশ বা পৃথিবীর মানুষের নিজস্ব স্বার্থের বিপরীত হয়, তবে তারা ঐ আইন মানতে চাইবে না এবং ঐ সত্তাকে উৎখাত করে ফেলবে বা ফেলতে চাইবে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থান–

মানব রচিত আইন

মানব রচিত আইন প্রয়োগকারী সত্তা অর্থাৎ সরকারের শক্তি সারা বিশ্বের মানুষের শক্তির থেকে বেশি থাকাতো দূরের কথা, তার নিজ দেশের জনগণের শক্তির তুলনায়ও সবসময় বেশি থাকে না। তাই তো দেখা যায়, মানব রচিত আইনের সরকার সামরিক বা গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত হয়। আর তখন অন্য ধরনের আইন চালু হয়ে যায়।

কুরআনের আইন

নিজের শক্তির ব্যাপারে কুরআনের আইন প্রয়োগকারী সত্তা (আল্লাহ) যা ঘোষণা করেছেন–

... ... اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ... ...

অনুবাদ : সকল শক্তি আল্লাহর করায়ত্ত।

(সুরা বাকারা/২ : ১৬৫)

... ... وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

অনুবাদ : আর আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

(সুরা বাকারা/২ : ২৮৪)

وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ ۚ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ .

অনুবাদ : আর পৃথিবীতে তোমরা (সকলে মিলে) আল্লাহকে অক্ষম (উৎখাত) করতে পারবে না। আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই ও সাহায্যকারীও নেই।

(সুরা শুরা/৪২ : ৩১)

... وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ .

অনুবাদ : ... ... আর তার কুরসি (ক্ষমতার গদি) আকাশ ও পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত; আর এ দুটির রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না।

(সুরা বাকারা/২ : ২৫৫)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এগুলোসহ আরও অনেক আয়াত হতে স্পষ্টভাবে জানা যায়– কুরআনের আইনের প্রণেতার শক্তি পৃথিবীর মানুষের সম্মিলিত শক্তির চেয়ে অপরিসীমভাবে বেশি। তাই, পৃথিবীর সকল মানুষ একসাথে মিলে চেষ্টা করলেও আল্লাহর সরকারকে উৎখাত করতে পারবে না।

প্রশ্ন হতে পারে, কুরআনের আইনের প্রণেতা যদি এতই শক্তিশালী হয়ে থাকেন, তবে তিনি কেন শক্তি প্রয়োগ করে সকলকে তাঁর আইন মানতে বাধ্য করেন না। এর উত্তর হলো– কুরআনের আইনের প্রণেতা তাঁর বানানো আইন অনুসরণ করা বা না করার ভিত্তিতে মানুষকে পরীক্ষা করতে চান। অতঃপর সে পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী তিনি তাদেরকে ইনসাফসহকারে পুরস্কার বা শাস্তি দিতে চান।

কাউকে কোনো কিছু মানা বা না মানার ভিত্তিতে পরীক্ষা নেওয়া এবং সে পরীক্ষার ভিত্তিতে ইনসাফ সহকারে শাস্তি ও পুরস্কার দিতে চাইলে তাকে

অবশ্যই মানা বা মানার ব্যাপারে স্বাধীনতা দিতে হবে। এটা Common sense-এর চিরসত্য রায়। তাই শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সকল মানুষকে তাঁর বানানো আইন অনুসরণ করতে বাধ্য করার মতো শক্তি থাকা সত্ত্বেও কুরআনের আইন প্রণেতা বিশেষ কারণ ছাড়া তাঁর সে শক্তি প্রয়োগ করেন না।

কোনো জনগোষ্ঠী বা জাতি যখন তাঁর আইন অমান্য করতে করতে একটা বিশেষ সীমা অতিক্রম করে যায় তখনই শুধু তিনি নিজ তৈরি প্রোগ্রামের মাধ্যমে তাঁর সেই শক্তি প্রয়োগ করেন। তবে সে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ঐ জনগোষ্ঠী বা জাতিকে তাঁর আইন মানতে বাধ্য করার পরিবর্তে তিনি সাধারণত পৃথিবী থেকে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেন। আদ, সামুদ ইত্যাদি জাতিকে তিনি এভাবে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন বলে কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন।

♣♣ তাহলে দেখা যায়, আইন প্রণেতা বা প্রয়োগকারী সত্তার শক্তির দৃষ্টিকোণ থেকেও কুরআনের আইন যুক্তিসংগত কিন্তু মানব রচিত আইন তা নয়।

মানদণ্ড-১.৬
আইন প্রণয়নকারীর স্থায়িত্ব

আইন প্রণয়নকারীকে হতে হবে চিরস্থায়ী। তা না হলে নতুন আইন প্রণয়নকারী এসে পূর্বের প্রণেতার অনেক আইন অকল্যাণকর, যথেষ্ট কল্যাণকর নয় বা পছন্দ নয় বলে পাল্টিয়ে ফেলবেন। ফলে বিভিন্ন সময়ের মানুষ একই কাজের জন্য বিভিন্নভাবে বা বিভিন্ন মাত্রায় শান্তি বা শাস্তি প্রাপ্ত হবে। এটা যুক্তিসংগত নয়।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থান–

মানব রচিত আইন

মানব রচিত আইনের প্রণয়নকারী (সরকার) ক্ষণস্থায়ী। আর নতুন সরকার এসে পূর্বের সরকারের অনেক আইন পরিবর্তন করে ফেলে। এটি একটি বাস্তব সত্য। তাই, এ দৃষ্টিকোণ থেকেও মানব রচিত আইনে বিভিন্ন সময় বা কালের মানুষ একই কাজের জন্য বিভিন্নভাবে বা মাত্রায় কল্যাণ বা শাস্তি পায়। এটি মোটেই যুক্তিসংগত নয়।

কুরআনের আইন

স্থায়িত্বের ব্যাপারে কুরআনের আইনের প্রণয়নকারী তাঁর অবস্থানের কথা বিভিন্নস্থানে বিভিন্নভাবে কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। ঐ বিষয়ক একটি বক্তব্য হলো—

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلۡحَیُّ الۡقَیُّوۡمُ ۚ لَا تَاۡخُذُهٗ سِنَۃٌ وَّلَا نَوۡمٌ ؕ ... ...

অনুবাদ : আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী; তন্দ্রা ও নিদ্রা তাকে স্পর্শ করে না। ... ...

(সুরা বাকারা/২ : ২৫৫)

ব্যাখ্যা : কুরআনের প্রণয়নকারীর আইনের প্রণেতা এখানে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি চিরস্থায়ী এবং তাকে তন্দ্রা ও নিদ্রা কখনও স্পর্শ করে না।

♣♣ তাই আইন প্রণয়নকারীর স্থায়িত্বের দৃষ্টিকোণ থেকেও মানুষের আইন যুক্তিসংগত নয় কিন্তু কুরআনের আইন শতভাগ যুক্তিসংগত।

মানদণ্ড-১.৭

আইন প্রণয়নকারীর কর্তৃত্বস্থলের বিস্তৃতি

আইন প্রণয়নকারী বা প্রয়োগকারী সত্তার কর্তৃত্ব স্থলের বিস্তৃতি শুধু একটি দেশ, শুধু মানুষ বা শুধু পৃথিবীতে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। তা হতে হবে মহাকাশ ও পৃথিবীর সকল স্থান ও সৃষ্টি জুড়ে।

কারণ—

১. আইন যদি শুধু একটি দেশের মানুষের ওপর চলে তবে বিভিন্ন দেশের মানুষ বিভিন্ন আইন দিয়ে শাসিত হবে। ফলে বিভিন্ন দেশের মানুষ অভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্নভাবে শান্তি বা শাস্তি (কষ্ট) পাবে। এটা যুক্তিসংগত নয়।

২. পৃথিবীর অন্য যে সকল সৃষ্টি (পশু-পক্ষী, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি) আছে তার ওপর যদি আইন প্রণেতার আইন বা কর্তৃত্ব না চলে তবে ঐ সকল সৃষ্টির ওপর নিশ্চয় অন্য প্রণেতার আইন চলবে। সে আইন মানুষের জন্য প্রণীত আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকবে। ফলে ঐ সকল সৃষ্টি দিয়ে মানুষের কল্যাণ না হয়ে অকল্যাণই হবে। এ রকম হলে মানুষের জীবন মোটেই শান্তিময় হবে না।

৩. মহাকাশে যদি অন্য সত্তার আইন চলে তবে সে আইনও পৃথিবীর মানুষের আইনের সাথে সামঞ্জস্যশীল না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকবে। ফলে মহাকাশের জানা-অজানা সকল সৃষ্টির আচরণ মানুষের জন্য কল্যাণকর না হয়ে অকল্যাণকরই হবে। আর তাহলে মানুষের জীবন শান্তিময় হওয়ার প্রশ্নই থাকবে না।

তাই কর্তৃত্বস্থলের বিস্তৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো আইন যুক্তিসংগত ও মানুষের জন্য কল্যাণকর হতে হলে সেটির বিস্তৃতি হতে হবে–

১. মহাকাশ ও পৃথিবীর সকল স্থান ও সৃষ্টি জুড়ে।
২. অন্য সকল সৃষ্টির জন্য প্রণীত আইন হতে হবে মানুষের জন্য প্রণীত আইনের সম্পূরক। অর্থাৎ মানুষের কল্যাণকে সামনে রেখেই অন্য সকল সৃষ্টির আইন রচিত হতে হবে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থান–

মানব রচিত আইন

মানব রচিত আইন যে দেশে রচিত হয়, সে দেশের মানুষের ওপরেই শুধু কার্যকর হয়। অর্থাৎ মানব রচিত আইনে বিভিন্ন দেশের মানুষ বিভিন্ন আইনে শাসিত হয়। তাই ঐ আইনে, অভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন দেশের মানুষ বিভিন্নভাবে শান্তি বা কষ্টপ্রাপ্ত হয়। আর মানব রচিত আইন মহাকাশ ও পৃথিবীর অন্য সকল সৃষ্টির ওপর প্রযোজ্য হবে বা মহাকাশ ও পৃথিবীর অন্য সকল সৃষ্টি মানুষের কর্তৃত্বের মধ্যে এসে যাবে, এটা কল্পনাও করা যায় না।

কুরআনের আইন

কর্তৃত্বস্থলের বিস্তৃতির সাথে সম্পর্কযুক্ত নানা ধরনের বক্তব্য কুরআনের আইনের প্রণেতা আল কুরআনে উপস্থাপন করেছেন। তার কয়েকটি হচ্ছে–

... ... وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ... ...

অনুবাদ : ... ... আর তার কুরসি (ক্ষমতার গদি) আকাশ ও পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত। ... ...

(সুরা বাকারা/২ : ২৫৫)

ব্যাখ্যা : কুরআনের আইনের প্রণেতা এখানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর ক্ষমতার বিস্তৃতি পৃথিবী ও মহাকাশ জুড়ে। অর্থাৎ পৃথিবী ও মহাকাশে মানুষসহ অন্য যত সৃষ্টি আছে, সে সকল সৃষ্টি জুড়েই হচ্ছে তাঁর আইনের প্রয়োগ স্থলের বিস্তৃতি।

... ... وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ .

অনুবাদ : অথচ আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে বিদ্যমান (সবই) ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁর (কুরআনের আইনের প্রণেতার) কাছে আত্মসমর্পণ করে আছে এবং তাঁর দিকেই তাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

(সুরা আল-ইমরান/৩ : ৮৩)

ব্যাখ্যা : কুরআনের আইনের প্রণেতা এখানে স্পষ্ট করে ঘোষণা দিচ্ছেন যে, মহাকাশ ও পৃথিবীর সকল সৃষ্টিই তাঁর কাছে বাধ্যতামূলকভাবে আত্মসমর্পণ করে আছে। অর্থাৎ সকলেই বাধ্যতামূলকভাবে তাঁর আইনের অধীন।

মানুষের ক্ষেত্রে এ বিষয়টিতে একটু ব্যতিক্রম আছে এবং তাও কুরআনের আইনের প্রণেতা আল কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। সে ব্যতিক্রমটি হলো– কুরআনের আইনের প্রণেতা মানুষের শরীরের ভেতরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের (Organs) কোষগুলোকে (Cells) অন্য সৃষ্টির মতো বাধ্যতামূলক তাঁর আইনের অধীন করে রেখেছেন। সে আইন ভাঙলেই রোগাক্রান্ত হতে হয়। অর্থাৎ শারীরিক অশান্তির সৃষ্টি হয়। কিন্তু মানুষের ইচ্ছা শক্তিকে তা করেননি। কারণ, প্রণীত আইন মানা বা না মানার ভিত্তিতে পরীক্ষা করে তিনি মানুষকে পুরস্কার বা শাস্তি দিতে চান। তাই, ইচ্ছা শক্তিকে বাধ্যতামূলক অধীন করে দিলে সেটি করা যৌক্তিক বা ন্যায়সংগত হয় না।

মানুষের ইচ্ছা শক্তিকে অধীন করা হয়নি। এটি আল্লাহ বিভিন্নভাবে কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। দুটি স্থানের বক্তব্য এখানে উল্লেখ করা হলো–

إِنَّا هَدَيْنَٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا .

অনুবাদ : নিশ্চয় আমরা তাকে (মানুষকে সঠিক) পথের সন্ধান দিয়েছি (এখন) হয় সে (নিজ ইচ্ছায় সে পথে চলে কল্যাণপ্রাপ্ত হয়ে) কৃতজ্ঞ হবে অথবা (অমান্য করার মাধ্যমে) অকৃতজ্ঞ হবে।

(সুরা দাহর/৭৬ : ৩)

ব্যাখ্যা : কুরআনের আইনের প্রণেতা এখানে বলে দিয়েছেন– তিনি মানুষের জীবন কল্যাণকরভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সকল আইন প্রণয়ন করে কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সে আইন মানা বা না মানার ব্যাপারে তাদের ইচ্ছা শক্তিকে বাধ্য করেননি। তাই মানুষ ইচ্ছা করলে তাঁর দেওয়া আইন মেনে চলে কল্যাণপ্রাপ্ত হয়ে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে। অথবা তাঁর দেওয়া আইন অমান্য করে দুনিয়া ও আখিরাতে অশান্তিতে পড়তে পারে।

... ... وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ... ...

অনুবাদ : ... ... যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাহলে তাদের সকলকে অবশ্যই সঠিক পথে একত্রিত করতেন ... ... (সুরা আনআম/৬ : ৩৫)

ব্যাখ্যা : এখানে কুরআনের আইনের প্রণেতা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন– তিনি চাইলে যারা তাঁর আইন মানতে চায় না তাদেরকে তাঁর আইন মেনে চলার জন্য বাধ্য করতে পারতেন। কিন্তু এটি তার নীতি নয়।

আর পৃথিবীর সকল কিছু যে মানুষের কল্যাণকে সামনে রেখে সৃষ্টি করা হয়েছে তা মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

هُوَ الَّذِىۡ خَلَقَ لَـكُمۡ مَّا فِى الۡاَرۡضِ جَمِيۡعًا ۗ ثُمَّ اسۡتَوٰۤى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰٮهُنَّ سَبۡعَ سَمٰوٰتٍ ... ...

অনুবাদ : তিনিই তোমাদের (কল্যাণের) জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তারপর আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং তাকে সাত আকাশে বিন্যস্ত করলেন। (সুরা বাকারা/২ : ২৯)

কুরআনের আইনের প্রণেতার কর্তৃত্বের পরিধি বিস্তৃতির ব্যাপারে উপরোক্ত কথাগুলো যে বাস্তব সত্য তার প্রমাণ হচ্ছে–

১. মহাকাশ ও পৃথিবীর অন্য সকল সৃষ্টি কুরআনের আইন প্রণেতার বানানো প্রাকৃতিক আইন মেনে চলছে তাই সেখানে কোনো সংঘাত-সংঘর্ষ বা অশান্তি নেই।
২. মহাকাশ ও পৃথিবীর (মানুষ বাদে) সব সৃষ্টির জন্য তৈরি প্রাকৃতিক আইনগুলো এমন যে, ঐ সব সৃষ্টি দিয়ে মানুষের কোনো না কোনো কল্যাণ হয় (Ecological balance)।
৩. অন্য সকল সৃষ্টি আল্লাহর দেওয়া প্রাকৃতিক আইন মেনে চলতে বাধ্য।
৪. মানুষের শরীরের কোষগুলো (Cells) আল্লাহর দেওয়া প্রাকৃতিক আইন (Naturel Law) মেনে চলতে বাধ্য। সে আইনের কোনো ব্যতিক্রম হলেই কোষগুলোর মধ্যকার শান্তি নষ্ট হয় এবং তখন অশান্তি অর্থাৎ রোগের সৃষ্টি হয়।
৫. মানুষের চিন্তা-শক্তি ব্যবহার করে কাজ করার স্বাধীনতা আছে বলেই মানুষ কুরআনের আইন অমান্য করেও পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারছে।

♣♣ তাই সহজেই বলা যায়– আইন প্রণেতা ও প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব স্থলের বিস্তৃতির দৃষ্টিকোণ থেকেও কুরআনের আইন যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর। কিন্তু মানব রচিত আইন তা নয়।

মানদণ্ড-১.৮

মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিকে প্রণীত আইনের বিস্তৃতি ও তার আনুপাতিক হার

আইনের বিস্তৃতি হতে হবে মানুষের জীবনের যত দিক আছে তার সকল দিকে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনৈতিক, যুদ্ধ-সন্ধি, পেশাগত, আন্তর্জাতিক ইত্যাদি সকল দিকে। আর এ সকল দিকের মধ্যে ব্যক্তি ও পারিবারিক আইনকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ ব্যক্তি নিয়ে পরিবার। পরিবার নিয়ে সমাজ। সমাজ নিয় দেশ। দেশ নিয়ে পৃথিবী। তাই ব্যক্তি মানুষ যদি ভালো হয়ে যায় তবে সমাজ, দেশ বা পৃথিবী ভালো তথা কল্যাণময় হতে বাধ্য।

একজন ব্যক্তি ভালো হয়ে গড়ে ওঠার ব্যাপারে সব থেকে বড়ো ভূমিকা রাখে তার পরিবার। জীবনের প্রথম কিছু বছর একটি মানব শিশু তার পরিবারের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থেকে বিভিন্ন শিক্ষা গ্রহণ করে। ঐ বছরগুলোতে যে শিক্ষা সে পায়, সারাটি জীবন সে শিক্ষার কিছু না কিছু প্রভাব তার ওপর অবশ্যই থাকে। তাই আইনের বিস্তৃতি ও আনুপাতিক হার, মানব জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল করার ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থান–

মানব রচিত আইন

মানব রচিত আইনের বিস্তৃতি জীবনের সকল দিকে থাকলেও সেখানে ব্যক্তি ও পারিবারিক আইন থেকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইনের দিকে অধিক নজর বা গুরুত্ব দেওয়া হয়। এটি যুক্তিসংগত নয়। ব্যক্তি খারাপ হয়ে গড়ে উঠলে রাষ্ট্রীয় আইন দিয়ে তাকে আয়ত্তে আনা কঠিন বা অসম্ভব হয়।

কুরআনের আইন

কুরআন ও সুন্নাহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– সেখানে মানুষের জীবনের সকল দিক পরিচালনার জন্য আইন আছে। আবার এটাও দেখা যায়– কুরআনে ব্যক্তি ও পারিবারিক বিষয় নিয়ে যত বক্তব্য, আলোচনা বা আইন আছে, অন্য বিষয় নিয়ে তা নেই। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ ব্যক্তি ও পারিবারিক আইনকে অন্য সকল দিকের আইনের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে।

♣♣ তাই জীবনের বিভিন্ন দিকের আইনের বিস্তৃতি ও তার গুরুত্বের আনুপাতিক হারের দৃষ্টিকোণ থেকেও কুরআনের আইন বেশি যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর।

মানদণ্ড-১.৯

আইন অমান্য করাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করতে পারে এমন কোনো বিষয় প্রণীত আইনে না থাকা

প্রণীত আইন অমান্য করাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করে এমন সকল বিষয় নিষিদ্ধ থাকতে হবে। কারণ, কোনো একটি কাজ করার নির্দেশ দেওয়া এবং সাথে সাথে সে কাজটি অমান্য করতে উৎসাহিত হয় এমন কর্মকাণ্ডের অনুমতি দেওয়া সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী বিষয়। তাই এ অবস্থা বিদ্যমান থাকা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থা–

মানব রচিত আইন

মানব রচিত আইনে বিভিন্ন বিষয়ে এমন অনেক আইন দেখা যায়, যা পরস্পর বিরোধী। যেমন–

১. ধর্ষণ (Rape) করা মানব রচিত আইনে নিষিদ্ধ। কিন্তু সাথে সাথে সেখানে মানুষের যৌন বাসনাকে জাগিয়ে তোলে এমন কর্মকাণ্ড (মহিলাদের অর্ধ নগ্ন পোশাকে চলাফেরা করা, যৌন সুড়সুড়ি দেয় এমন লিফলেট, পোস্টার, বই, সিনেমা, নাটক, গান ইত্যাদি) নিষিদ্ধ নয়।

২. মদ খেয়ে গাড়ি চালানো বা অসামাজিক কাজ করা নিষিদ্ধ। কিন্তু মদ উৎপাদন করা, বেচাকেনা করা ও খাওয়া নিষিদ্ধ নয়।

৩. সকল শিশু সৎ নাগরিক বা নীতিবান মানুষ হয়ে গড়ে উঠুক বলে কামনা করা কিন্তু অন্যদিকে ভিডিও গেম্‌স, টেলিভিশন, সিনেমা, নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে গোলাগুলি, মারামারি, কাটাকাটি, চোরাকারবারী, মানুষ ঠকানো বা ফাঁকি দেওয়ার পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ের ব্যাপক প্রচারের অনুমতি দেওয়া।

কুরআনের আইন

কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো বিধান নেই। এ আইনে অপরাধ করা বা অপরাধে সহযোগিতা করা বা অপরাধ করার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করাও সমান অপরাধ। অর্থাৎ যে কাজটি নিষিদ্ধ সেই কাজকে উৎসাহিত করে এমন সকল কর্মকাণ্ডও নিষিদ্ধ।

যেমন–

১. ধর্ষণ (Rape) কুরআনের আইনে নিষিদ্ধ। সাথে সাথে সেখানে মানুষের যৌন বাসনাকে জাগিয়ে তোলে এমন সকল কিছুই নিষিদ্ধ।

২. মদ খাওয়া নিষিদ্ধ। সাথে সাথে সেখানে মদ উৎপাদন ও বেচাকেনাও নিষিদ্ধ।

♣♣ তাই, এ দৃষ্টিকোণ থেকেও কুরআনের আইন মানুষের আইন থেকে অধিক যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর।

মানদণ্ড-২.১
আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং আইন প্রণয়নকারী ব্যক্তি, সত্তা বা সংস্থার মধ্যে সম্পর্ক

আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের হতে হবে আইন প্রণয়নকারীর প্রতি শতভাগ আনুগত্যশীল। অর্থাৎ তাদের কোনো স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও ক্ষমতা থাকবে না। তা থাকলে কোনো না কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী কোনো না কোনো আইন সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করবেই। আর যারা দ্বিমত পোষণ করবে তারা সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে আইন বাস্তবায়নের চেষ্টাতো করবেই না বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। ফলে ঐ আইন তার প্রণেতার ইচ্ছা অনুযায়ী শতভাগ শান্তি দিতে পারবে না। এ অবস্থা যেকোনো আইন কল্যাণকর হওয়ার ব্যাপারে একটা বিরাট বাধা।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থান–

মানব রচিত আইন

মানব রচিত আইন বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মানুষ এবং তাদের সকলের স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও কিছু না কিছু ক্ষমতা আছে। তাই সরকারের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐ সরকারের প্রতি মনে-প্রাণে শতভাগ আনুগত্যশীল হওয়া অসম্ভব। এ কারণে, একটি সরকারের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী সকল আইন বাস্তবায়নের জন্য মনে-প্রাণে সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে এমনটি হওয়া অসম্ভব। বরং অনেকে আইন বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইন বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ দুই ধরনের–

- মানুষ
- ফেরেশতা

মানুষের দায়িত্ব শুধু দুনিয়ায় আর ফেরেশতাদের দায়িত্ব দুনিয়া ও আখিরাতে।

কুরআনের আইনের দুনিয়ার অংশ বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্তরা মানুষ হলেও তাদেরকে প্রথমে ঈমান আনার মাধ্যমে কুরআনের আইন প্রণেতার প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীল হওয়ার ঘোষণা দিতে হয়। অর্থাৎ তাদের সকলকে ঘোষণা দিতে হয় যে– কুরআনের আইন প্রণেতার তৈরি করা সকল আইন মানা ও বাস্তবায়নের ব্যাপারে তারা মনে-প্রাণে সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে। আর ঈমানের দাবি অনুযায়ী ঐ ব্যক্তিরা সবাই মনে-প্রাণে এটাও বিশ্বাস করে যে, তাদের সকল কাজ নিখুঁতভাবে নিরীক্ষণ করা হচ্ছে এবং মৃত্যুর পর সেই নিরীক্ষণ পর্যালোচনা করে নিখুঁত পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়া হবে।

তাই মানুষ হওয়ার জন্য স্বাভাবিকভাবে কিছু ভুল-ত্রুটি হলেও মানুষ রচিত আইন বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তুলনায় তারা বেশি আনুগত্যশীল ও দায়িত্বশীল হবেন এটাই যুক্তিসংগত। যারা মুনাফিক (মুখে ঈমানের ঘোষণা দেয় কিন্তু অন্তরে নয়) তাদের কথা অবশ্য ভিন্ন। তবে এই মুনাফিকদের নিকৃষ্টতম জাহান্নামে যেতে হবে এ ঘোষণা আল্লাহ দিয়ে রেখেছেন।

আইন বাস্তবায়নের জন্য কুরআনের আইন প্রণেতার অন্য সৃষ্টি ফেরেশতাদের অবস্থা সম্পর্কে কুরআনের আইন প্রণেতা জানিয়ে দিয়েছেন যে–

১. তাদের কোনো স্বাধীন চিন্তাশক্তি বা ক্ষমতা নেই।
২. তাদের মানুষের মতো খাওয়া-দাওয়া, প্রকৃতির ডাক, ক্লান্তি, বিশ্রাম, ঘুম, পারিবারিক জীবন ইত্যাদি নেই।
৩. সারাক্ষণ কুরআনের আইন প্রণেতার আনুগত্যশীল থাকা এবং যে কাজ তাদের যেভাবে করতে বলা হয়েছে সে কাজ সেভাবে করা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক।

ওপরের কথাগুলো কুরআনের আইনের প্রণেতা আল কুরআনের মাধ্যমে এভাবে জানিয়ে দিয়েছেন–

يُسَبِّحُونَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ .

অনুবাদ : তারা (ফেরেশতারা) রাত ও দিন (আল্লাহর) গুণকীর্তন করে, তারা ক্লান্ত হয় না।

(সুরা আম্বিয়া/২১ : ২০)

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ .

অনুবাদ : আর আকাশমণ্ডলীতে যা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যত জীব-জন্তু আছে সবই আল্লাহকে সিজদা করে (আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পন করে আছে) এবং ফেরেশতাগণও, আর তারা অহংকার করে না।

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৯)

...عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

অনুবাদ : ... ... যাতে (জাহান্নামে) নিয়োজিত আছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাগণ যারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে।

(সুরা তাহরীম/৬৬ : ৬)

অন্যদিকে পরকালের জগতে সকল কাজ করার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে কুরআনের আইন প্রণেতার এই ফেরেশতা কর্মচারীরা।

দুনিয়ায় ঐ ফেরেশতা কর্মচারীদের কিছু কাজ হচ্ছে–

১. মানুষ ছাড়া অন্য সকল সৃষ্টিকে এমনভাবে পরিচালনা করা যাতে তারা মানুষের কল্যাণে আসে।

২. মানুষের সকল কর্মকাণ্ডকে নিখুঁতভাবে নিরীক্ষণ করা এবং সে নিরীক্ষণের রেকর্ড সংরক্ষণ করা।

৩. আল্লাহর তৈরি করে দেওয়া প্রাকৃতিক ও অন্যান্য নিয়ম-কানুন অমান্য করার দরুন যে বিপদ মানুষের ওপর আসার কথা, তার অনেকটিকে ঘটতে না দেওয়া। এ কথাটা আল কুরআনে এভাবে বলা হয়েছে–

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ط .

অনুবাদ : আর তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল এবং অনেক বিপদ-আপদ তিনি ক্ষমা করে দেন (ঘটতে দেন না)।

(সুরা আস-শুরা/৪২ : ৩০)

৪. আইন অমান্য করতে করতে সীমা অতিক্রম করে গেলে কোনো জনগোষ্ঠী বা জাতিকে শাস্তি দেওয়া বা ধ্বংস করে দেওয়া।

৫. শত্রুদের মাধ্যমে আইন মান্যকারীদের ওপর অতিমাত্রায় বিপদ আসলে তাদেরকে নানাভাবে সাহায্য করা।

♣♣ তাহলে আইন প্রণেতা ও প্রয়োগকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ থেকেও কুরআনের আইন যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর কিন্তু মানব রচিত আইন তা নয়।

মানদণ্ড-২.২

আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরপেক্ষতা

আইন প্রণেতার মতো আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরও লিঙ্গ, বংশ, গোত্র, রং, শ্রেণি, দল, মতবাদ ও দেশের দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হতে হবে। তা না হলে, নিরপেক্ষ থেকে তারা আইন বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সকল বিষয়ে সঠিক ভূমিকা রাখতে পারবে না।

এ ব্যাপারে উভয় আইনের অবস্থা–

মানব রচিত আইন

মানব রচিত আইনের প্রয়োগকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তথা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কোনো না কোনো লিঙ্গ, বংশ, গোত্র, রং, শ্রেণি, দল, মতবাদ বা দেশের অবশ্যই হবে। তাই তাদের পক্ষে ঐ সকল দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকে, আইন বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল বিষয়ে, সকল মানুষের সঙ্গে সমান ব্যবহার করা সম্ভব নয়। তাই তো কম হোক বা বেশি হোক, পৃথিবীর সকল দেশে দেখা যায়–

১. এক দল বা মতবাদে বিশ্বাসী সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অন্য দল ও মতবাদে বিশ্বাসী জনতার ওপর সমান আচরণ করতে পারে না।
২. এক দেশের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তার দেশের জনগণ ও অন্য দেশের জনগণের প্রতি সমান আচরণ করতে ব্যর্থ হয়।
৩. এক লিঙ্গের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অন্য লিঙ্গের মানুষের প্রতি সমান আচরণ করতে ব্যর্থ হয়।
৪. এক বর্ণের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা একই দেশের বা অন্য দেশের ভিন্ন বর্ণের মানুষের প্রতি ন্যায়সংগত আচরণ করতে পারে না।
৫. এক বংশ বা গোত্রের সরকারি কর্মচারীরা অন্য বংশ বা গোত্রের লোকদের প্রতি সমান আচরণ করতে ব্যর্থ হয়।

আর যেহেতু মানুষের আইনের প্রয়োগ দুনিয়ায় শেষ হয়ে যায়, তাই এই অবিচারের ক্ষতিপূরণ হওয়ার কোনো সুযোগও থাকে না।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনের দুনিয়ার অংশের প্রয়োগকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও মানুষ। কিন্তু ঐ আইনে প্রকৃতভাবে বিশ্বাসী লোকদের মানসিক দিক দিয়ে এমনভাবে তৈরি করা হয়– যেন তারা লিঙ্গ, বংশ, গোত্র, রং, দল, মতবাদ ও দেশের দৃষ্টিকোণ থেকে নিরপেক্ষ থেকে সকল দায়িত্ব পালন করার উপযোগী

হয়। তারপরও এ কথা নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যাবে না যে, তাদের সকলেই ঐ সকল বিষয়ে শতভাগ নিরপেক্ষ থেকে সকল দায়িত্ব পালন করে। তবে কুরআনের আইনের এ অভাবটা পূরণ হয়ে যাবে ঐ আইনে থাকা চূড়ান্ত বিচারের ব্যবস্থায়। যেটি অনুষ্ঠিত হবে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার (কিয়ামত) পর।

♣♣ এ দৃষ্টিকোণ থেকেও কুরআনের আইন মানব রচিত আইন থেকে অনেক অনেক বেশি যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর।

মানদণ্ড-৩.১
বিচার দুই স্তরে (প্রাথমিক ও চূড়ান্ত) হওয়া

আইন নিখুঁত হলেই তা মানুষের জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল করতে পারবে এমনটি নয়। এর জন্য থাকতে হবে একটি নিখুঁত বিচার ব্যবস্থা। আর বিচার নিখুঁত ও পরিপূর্ণ হতে হলে তা হতে হবে দুই স্তরে। যেমন−

১. প্রাথমিক স্তর (দুনিয়ার স্তর)।
২. চূড়ান্ত স্তর (পরকালীন স্তর)।

প্রাথমিক স্তর

এ স্তরের বিচার হতে হবে দুনিয়ায় মানুষের জীবদ্দশায়। আর এ স্তরটি উপস্থিত থাকার প্রয়োজনীয়তা−

১. এটি না থাকলে যারা চূড়ান্ত বিচারে বিশ্বাস করে না বা করবে না, তারা আইন মানতে চাইবে না। ফলে তারা আইন অমান্য করে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করবে।
২. চূড়ান্ত বিচার কতদিন বা কত হাজার বছর পরে হবে তা মানুষ জানে না। বিচার দেরিতে হলে সে বিচারের প্রভাব (Effect) মানুষের ওপর তেমন পড়ে না। তাই তো আমরা জানি ও মানি− Justice delayed justice denied (বিচার বিলম্বিত করা বিচার অস্বীকার করার সমান)।

চূড়ান্ত স্তর

এ বিচার হতে হবে পরকালে। অর্থাৎ পৃথিবী ধ্বংস (কিয়ামত) হয়ে যাওয়ার পর। ওপরে উল্লিখিত ও পরে আসা সকল বিষয় পূরণ করে নিখুঁত বিচার দুনিয়ায় করা সম্ভব নয়। তাইতো দুনিয়ার বিচারে দেখা যায়−

১. বহু মানুষ সৎপথে থেকে জীবন পরিচালনা করার জন্য অনেক কষ্টসহকারে জীবনযাপন করে দুনিয়া থেকে চলে যায়। অর্থাৎ সততার জন্য কোনো পুরস্কার না পেয়ে সে দুনিয়া থেকে চলে যায়।
২. অনেক মানুষ অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে গাড়ি-বাড়ি ইত্যাদিসহ অত্যন্ত দাপটের সাথে শান্তিতে জীবনযাপন করে দুনিয়া থেকে চলে যায়। অর্থাৎ অসৎ কাজের জন্য শাস্তি না পেয়ে সে দুনিয়া থেকে চলে যায়।
৩. যথাযথ সাক্ষী-প্রমাণ বা তথ্য না থাকার দরুন অনেক অপরাধীর শাস্তি হয় না বা হলেও কম হয়।
৪. ভুল বা মিথ্যা তথ্য প্রমাণ ও সাক্ষীর জন্য অনেক নির্দোষ মানুষের শাস্তি হয় বা বেশি শাস্তি হয়।

তাই দুনিয়ার বিচারের সাথে চূড়ান্ত তথা পরকালীন বিচার থাকতে হবে। চূড়ান্ত বিচারে যা হবে−

১. দুনিয়ার বিচারে যারা পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হয়েছে বা শাস্তি থেকে বেঁচে গেছে তারা ইনসাফ সহকারে যথাযথ পুরস্কার ও শাস্তি পেয়ে যাবে।
২. যে সকল আমল (কর্ম) চলতে থাকে (আমলে জারিয়া) তার পরিপূর্ণ পুরস্কার বা শাস্তি মানুষ পেয়ে যাবে।

বিচার ব্যবস্থার স্তরের দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থান−

মানব রচিত আইন

মানব রচিত আইনে দুনিয়ার বিচার আছে। কিন্তু পরকালীন বিচার নেই।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনে উভয় স্তর আছে। তাই, দুনিয়ার শাস্তি থেকে কেউ কোনো কারণে বেঁচে গেলে পরকালীন শাস্তি থেকে বাঁচতে পরবে না।
এ কথাটি কুরআনের আইন প্রণেতা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে−

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ .

অনুবাদ : তবে কি যারা মন্দ কাজ করে তারা মনে করে যে, তারা আমাদের আওতার বাইরে চলে যাবে? তাদের ফায়সালা কতই না মন্দ!

(সুরা আনকাবুত/২৯ : ৪)

ব্যাখ্যা : কুরআনের আইনের প্রণেতা এখানে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন− দুনিয়ায় যারা পাপ কাজ করছে তাদের এ ধারণা করা সম্পূর্ণ ভুল হবে যে

তিনি তাদেরকে পাকড়াও করতে পারবেন না। দুনিয়ায় তাঁর আইনে থাকা শাস্তি থেকে কোনো ক্ষেত্রে মানুষ বেঁচে যেতে পারলেও চূড়ান্ত বিচারের দিন তারা কোনো মতেই বাঁচতে পারবে না।

♣♣ এ দৃষ্টিকোণ থেকেও কুরআনের আইন মানব রচিত আইন থেকে অনেক অনেক বেশি যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর।

মানদণ্ড-৩.২

বিচারক– বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ ও সব ধরনের প্রভাবমুক্ত হওয়া

বিচার নিখুঁত হতে হলে বিচারককে অত্যন্ত বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ এবং সকল ধরনের প্রভাবমুক্ত হতে হবে।

এ দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী উভয় আইনের অবস্থান–

মানব রচিত আইন

মানব রচিত আইনে বিচার হয় এক স্তরে তথা শুধু দুনিয়ায় এবং বিচারক হয় মানুষ। কোনো মানুষ শতভাগ বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ ও সব ধরনের প্রভাবমুক্ত হতে পারে না। তাই সকল বিচারে কম-বেশি দুর্বলতা স্থায়ীভাবে থেকে যায়।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনে বিচারের দুনিয়ার স্তরে বিচারক থাকবে মানুষ। তাই সেখানে মানব রচিত আইনের মতো দুর্বলতা থাকলেও তা অপেক্ষাকৃত কম থাকবে। কারণ এখানে যিনি বিচারক হবেন তিনি তার বিচার কাজের জন্য পরকালে জবাবদিহি করার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাসী হবেন। এরপরও সেখানে যে দুর্বলতা থেকে যাবে তা চূড়ান্ত বিচার তথা পরকালীন বিচারে শুধরিয়ে যাবে। কারণ ঐ বিচারের বিচারক হবেন মহান আল্লাহ। যিনি শতভাগ বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ ও প্রভাবমুক্ত।

♣♣ এ দৃষ্টিকোণ থেকেও কুরআনের আইন মানব রচিত আইন থেকে অনেক অনেক বেশি যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর।

মানদণ্ড-৩.৩

আইন, নিরীক্ষণ পদ্ধতি ও মানা বা না মানার পরিণাম মানুষের জানতে পারার বিষয়টি নিশ্চিত করা

আইন, নিরীক্ষণ পদ্ধতি ও মানা বা না মানার পরিণাম কী হবে তা শুধু প্রণয়ন করে রাখলেই চলবে না। সেগুলো মানুষ জানতে পেরেছে, এ বিষয়টি নিশ্চিত হতে হবে। তাই, এ বিষয়গুলো মানুষকে জানানোর জন্য যত ধরনের ব্যবস্থা আছে তার সবগুলো প্রয়োগ করতে হবে। কারণ, জানা না থাকলে মানার প্রশ্ন আসে না। আবার না জানার কারণে কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে শাস্তি দেওয়া যুক্তিসংগত নয়। অন্যদিকে ঐ বিষয়গুলো জানতে পারলে মানুষ আইন মানতে উৎসাহিত হবে এবং অমান্য করার সাহস পাবে না।

এ ব্যাপারে মানব রচিত ও কুরআনের আইনের অবস্থান–

মানব রচিত আইন

মানব রচিত আইনে, আইন সম্পর্কিত উপরোক্ত বিষয়গুলো সকল মানুষ যাতে জানতে পারে সে লক্ষ্যে তেমন ব্যাপক কোনো ব্যবস্থা সাধারণত নেওয়া হয় না। সকল মানুষের জন্য তা জানা বাধ্যতামূলকও করা হয় না। তাই তো দেখা যায়–

১. মানব রচিত আইনে, আইন ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা ছাড়া অধিকাংশ মানুষ ঐ বিষয়গুলো সম্পর্কে তেমন জ্ঞান রাখে না।

২. আইন ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তিরাও তাদের নির্দিষ্ট অংশের (Sub Speciality) আইনগুলোই শুধু ভালো জানে।

কুরআনের আইন

আইন, নিরীক্ষণ পদ্ধতি, মানা বা না মানার পরিণাম ইত্যাদি না জানার কারণে কেউ যদি আইন অমান্য করে তবে তাকে শাস্তি দেওয়া কুরআনের আইন প্রণেতার নীতি নয়। তথ্যটি পরিষ্কারভাবে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন নিম্নোক্তভাবে–

... ... وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا .

অনুবাদ : ... ... আর আমরা রসূল (বার্তাবাহক) না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেই না।

(সুরা বনী-ইসরাইল/১৭ : ১৫)

وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ .

অনুবাদ : আর আমরা এমন কোনো জনপদ ধ্বংস করিনি যার জন্য সতর্ককারী ছিল না।

(সুরা শু'য়ারা/২৬ : ২০৮)

ذٰلِكَ اَنۡ لَّمۡ يَكُنۡ رَّبُّكَ مُهۡلِكَ الۡقُرٰى بِظُلۡمٍ وَّاَهۡلُهَا غٰفِلُوۡنَ .

অনুবাদ : এটি (দ্বীন জানিয়ে দেওয়া) এ জন্য যে, তোমার রব কোনো জনপদকে (তার আদেশ সম্পর্কে) অনবহিত থাকা অবস্থায় ধ্বংস করার মতো একটি জুলুম করেন না।

(সুরা আন'আম/৬ : ১৩১)

সম্মিলিত শিক্ষা : এ সকল আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়– আইন, নিরীক্ষণ পদ্ধতি, মানা বা না মানার পরিণাম ইত্যাদি যে ব্যক্তি কোনোভাবে জানতে পারেনি, তাকে আইন না মানার জন্য শাস্তি দেওয়া আল্লাহর নীতি নয়। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী পৃথিবীর সকল মানুষকে পরকালে বিচারের আওতায় আনা হবে এবং দুনিয়ার জীবন পরিচালনার ভিত্তিতে সকলে যথাযথ পুরস্কার বা শাস্তি পাবে।

তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায়– মহান আল্লাহ পৃথিবীর সকল মানুষকে তাঁর প্রণীত আইন, নিরীক্ষণ পদ্ধতি, মানা বা না মানার পরিণাম ইত্যাদি জানার কোনো না কোনো ব্যবস্থা অবশ্যই করেছেন।

চলুন এখন জানা যাক, মহান আল্লাহ উল্লিখিত বিষয়ে কী কী ব্যবস্থা করেছেন–

তথ্য-১

وَ اِذۡ اَخَذَ رَبُّكَ مِنۡۢ بَنِيۡۤ اٰدَمَ مِنۡ ظُهُوۡرِهِمۡ ذُرِّيَّتَهُمۡ وَ اَشۡهَدَهُمۡ عَلٰۤى اَنۡفُسِهِمۡ ۚ اَلَسۡتُ بِرَبِّكُمۡ ؕ قَالُوۡا بَلٰى ۚۛ شَهِدۡنَا ۚۛ اَنۡ تَقُوۡلُوۡا يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنۡ هٰذَا غٰفِلِيۡنَ ۙ .

অনুবাদ : আর যখন তোমার রব আদম সন্তানের বুক ও কোমরের হাড়ের মধ্যবর্তী স্থানের পিঠের দিক (যুহুর) থেকে তাদের বংশধরদের বের করলেন এবং তাদেরকে (মানুষকে) নিজেদের ওপর সাক্ষী রেখে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন– আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বললো– অবশ্যই। (আর) আমরা সাক্ষী রইলাম। (এ অঙ্গীকার নেওয়া) এজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বলতে পারো– নিশ্চয় আমরা এ (রুবুবিয়াত) বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম। (সুরা আ'রাফ/৭ : ১৭২)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা–

'তাদেরকে (মানুষকে) নিজেদের ওপর সাক্ষী রেখে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন- আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বললো– অবশ্যই। (আর) আমরা সাক্ষী রইলাম' অংশের ব্যাখ্যা : এ বক্তব্য হতে জানা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা প্রশ্ন ও উত্তর আদান প্রদানের মাধ্যমে সকল মানব রুহের কাছ থেকে তাকে 'রব' মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার চেয়েছেন এবং সকল মানব রুহ সেচ্ছায় সে অঙ্গীকার করেছে।

'(এ অঙ্গীকার নেওয়া) এজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বলতে পারো– নিশ্চয় আমরা এ (রুবুবিয়াত) বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম' অংশের ব্যাখ্যা : এ বক্তব্য থেকে জানা যায়, আল্লাহকে 'রব' হিসেবে অঙ্গীকার নেওয়ার ১ নং কারণ হলো– মানুষ যাতে কিয়ামতের দিন বলতে না পারে তারা রুবুবিয়াতের বিষয়সমূহ জানতো না। তাই, রুবুবিয়াত বিরোধী বিভিন্ন গুনাহ করেছে। কারণ, না জানার জন্য কেউ অপরাধ করলে তাকে শাস্তি দেওয়া ন্যায় বিচার নয়।

রুবুবিয়াত একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এতে অন্তর্ভুক্ত আছে আল্লাহর–

১. সকল ধরনের (সত্তা, গুণাগুণ, হক ও ইখতিয়ার) তৌহিদ।

২. সকল আদেশ-নিষেধ, উপদেশ ও তথ্য।

প্রশ্ন হলো– রুবুবিয়াত সম্পর্কিত উল্লিখিত সকল বিষয় সরাসরি জানিয়ে অঙ্গীকারটি নেওয়া হয়েছিল কি না?

প্রশ্নটির উত্তর– রুবুবিয়াত সম্পর্কিত উল্লিখিত সকল বিষয় সরাসরি জানিয়ে অঙ্গীকারটি নেওয়া হয়নি। এ তথ্যটি কুরআন হতে জানা যায় এভাবে–

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ؕ .

অনুবাদ : (কুরআনের মাধ্যমে) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে এমন বিষয় যা সে (জন্মগতভাবে) জানে না।

(সুরা আলাক/৯৬ : ৫)

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ؕ .

অনুবাদ : যেমন আমরা তোমাদের মাঝে তোমাদের মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদের কাছে আমার আয়াত পাঠ করে শোনায়,

তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করে, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেয় এবং তোমাদেরকে (এমন বিষয়) শিক্ষা দেয় যা তোমরা পূর্বে (জন্মগতভাবে) জানো না। (সুরা বাকারা/২ : ১৫১)

... ... فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ .

অনুবাদ : ... ... এরপর যখন (যুগে যুগে) আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে পথনির্দেশিকা (কিতাব) যাবে, যারা আমার সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণও থাকবে না। (সুরা বাকারা/২ : ৩৮)

তাই সুরা আ'রাফের ১৭২ নং আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়–

১. রুহের জগতে আল্লাহর রুবুবিয়াতের সত্তাভিত্তিক একত্ববাদ অমান্য না করার ব্যাপারে সরাসরি অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল।
২. রুবুবিয়াতের অন্যান্য বিষয়ে যে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল তা হলো– যুগে যুগে রুবুবিয়াতের সকল বিষয়ের নির্ভুল তথ্যধারণকারী গ্রন্থ (কিতাব) তাঁর কাছ থেকে পৃথিবীতে যাবে। সে গ্রন্থ অধ্যয়ন করে মানুষকে রুবুবিয়াত সম্পর্কিত সকল কিছু নির্ভুলভাবে জানতে হবে এবং তা অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করতে হবে। অন্যথায় কিয়ামতের দিন রুবুবিয়াত বিরোধী শিরক ও অন্য কবীরা গুনাহ নিয়ে উপস্থিত হয়ে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

তথ্য-২

اَوْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْۚ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ .

অনুবাদ : অথবা (অঙ্গীকার নেওয়ার অন্য কারণ) তোমরা যেন (কিয়ামতের দিন) না বলতে পারো, পূর্বে আমাদের বাপ-দাদারা শিরক করেছে, আমরা তাদের পরবর্তী বংশধর। তবে কি পথভ্রষ্টরা যা করেছে সে জন্য আপনি আমাদের ধ্বংস করবেন?

(সুরা আ'রাফ/৭ : ১৭৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে রুহের জগতে অঙ্গীকার নেওয়ার ২ নং কারণটি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণটি হলো– কিয়ামতের দিন মানুষ যাতে বলতে না পারে, রুবুবিয়াতের বিষয়সমূহ জানা না থাকায় তাদের বাপ, দাদা,

আকাবের ও মনীষীরা যে সকল শিরক করতো, অন্ধ অনুসরণ (তাকলীদ) করে তারা তা করেছিল। তাই পথভ্রষ্ট বাপ, দাদা, আকাবের ও মনীষীদের ভুলের কারণে তাদেরও কি ধ্বংস তথা জাহান্নামের স্থায়ী অধিবাসী হতে হবে? এ কথা বলার সুযোগ থাকলে অনুসরণের মাধ্যমে শিরক করার জন্য মানুষকে শাস্তি দেওয়া ন্যায় বিচার হবে না।

তাই আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়–

ক. রুহের জগতে মহান আল্লাহ সকল মানব রুহ থেকে ২য় যে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন তা হলো– মানুষ বাপ, দাদা, আকাবের ও মনীষীদের অন্ধ অনুসরণ (তাকলীদ) করে শিরক করবে।

খ. অঙ্গীকারটি নেওয়ার সময় আরও জানিয়ে দেওয়া হয়–

১. অন্ধ অনুসরণের মাধ্যমে করা শিরক নিয়ে পরকালে আসলে ধ্বংস তথা জাহান্নামের স্থায়ী অধিবাসী হবে।

২. অন্ধ অনুসরণ যেন না করতে হয় সে জন্য সকল মানুষকে তিনি জ্ঞানের একটি উৎস দেবেন। জ্ঞানের সে উৎসটি হলো Common sense/আকল/বিবেক।

উৎসটিকে যে পদ্ধতিতে মানুষকে দেওয়া হয়েছে–

১. প্রথমে রুহের জগতে ক্লাস নিয়ে মহান আল্লাহ উৎসটির বুনিয়াদি জ্ঞানভান্ডার সকল রুহকে শিখিছে দেন। এ তথ্যটি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে–

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ .

অনুবাদ : অতঃপর তিনি আদমকে সকল (গুণবাচক) ইসম শেখালেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে উপস্থাপন করলেন, আর বললেন– তোমরা আমাকে এ (গুণবাচক) ইসমগুলো সম্পর্কে বলো যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো।

(সুরা বাকারা/২ : ৩১)

২. এরপর মহান আল্লাহ 'ইলহাম'-এর মাধ্যমে উৎসটিকে সকল মানব ভ্রূণের ব্রেইনে দিয়ে দিয়েছেন। এ তথ্যটি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে–

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝ .

অনুবাদ : শপথ মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে (মনকে) সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় ও ন্যায় (বোঝার শক্তি/উৎস Common sense)।

(সুরা আশ্-শামস/৯১ : ৭-৮)

৩. যান্ত্রিক জ্ঞানের শক্তি কম্পিউটারের মতো উৎসটিকে জন্মগতভাবে দেওয়া হয়েছে বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Processor) ও নীতিমালা (Programme)।

অন্যদিকে আইন তথা ইসলামের বিধি-বিধান সকলের জ্ঞানের আওতায় আসা নিশ্চিত করার জন্য মহান আল্লাহ অন্য যে সকল ব্যবস্থা নিয়েছেন তা হলো–

১. যুগে যুগে সকল মৌলিক আইন– নিখুঁত এবং নির্ভুলভাবে লিপিবদ্ধ করা গ্রন্থ পাঠিয়েছেন। ঐ গ্রন্থের সর্বশেষ সংস্করণ হলো আল কুরআন।
২. কুরআনের সাধারণ জ্ঞানার্জন করা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক (ফরজে আইন) করেছেন।
৩. কুরআনের সাধারণ জ্ঞানার্জন করা মু'মিনের ১ নং কাজ তথা সবচেয়ে বড়ো সাওয়াবে কাজ এবং কুরআনের জ্ঞান না থাকা শয়তানের ১ নং কাজ তথা সবচেয়ে বড়ো গুনাহর কাজ বলে জানিয়ে দিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'মুমিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ'** (গবেষণা সিরিজ-৪) নামক বইটিতে।
৪. কুরআনের জ্ঞান যাতে কোনো মুসলমান ভুলতে না পারে সে জন্য দিনে পাঁচ বার কুরআনের কিছু অংশ সালাতে পড়া বাধ্যতামূলক করেছেন।
৫. আল কুরআনের তথ্য যার জানা আছে, তার জন্য অপরকে সে তথ্য জানানো বাধ্যতামূলক করেছেন। আর ইচ্ছাকৃতভাবে বিনা কারণে তা অপরকে না জানানোর জন্য কঠিক শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন।
৬. আল্লাহর কিতাবের আইনগুলো এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় ব্যাখ্যা করে ও বাস্তবে প্রয়োগ করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য যুগে যুগে প্রতিনিধি (নবী-রসূল) পাঠিয়েছেন।

♣♣ তাই, আলোচ্য দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআনের আইন মানুষের আইন থেকে অনেক অনেক বেশি যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর।

মানদণ্ড-৩.৪
আইন মানা বা না মানার বিষয়টি নিখুঁতভাবে নিরীক্ষণের (Monitoring) ব্যবস্থা থাকা

আইন মানা বা না মানার ওপর ভিত্তি করে যদি মানুষকে পুরস্কার বা শাস্তি দিতে হয়, তবে আইন মানা বা না মানার বিষয়টি অবশ্যই নিখুঁতভাবে নিরীক্ষণ করতে হবে। এটি একটি চিরসত্য ও সহজ বোধগম্য বিষয়। তাই পৃথিবীর সকল সরকারই তা করে থাকে। কিন্তু নিরীক্ষণের ভিত্তিতে যদি যুক্তিসংগত, ত্রুটিহীন ও পরিপূর্ণ পুরস্কার বা শাস্তি দিতে হয়, তবে সে নিরীক্ষণকে নিম্নের শর্তগুলো অবশ্যই পূরণ করতে হবে–

১. মানুষের দিন ও রাত, প্রকাশ্য ও গোপন সকল কাজ নিরীক্ষিত হওয়া।
২. বাহ্যিক কাজের সাথে মনের অবস্থাও নিরীক্ষণ করা।
৩. নিরীক্ষণের পদ্ধতিটি নিখুঁত হওয়া।
৪. যে সকল কাজের ফলাফল চালু থাকে (আমলে জারিয়া), সে সকল কাজের নিরীক্ষণ পৃথিবী ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত চালু থাকা।

চলুন এখন নিরীক্ষণের এ শর্তগুলো নিয়ে উভয় আইনের অবস্থান পর্যালোচনা করা যাক–

১. দিন ও রাত এবং প্রকাশ্য ও গোপন সকল কাজ নিরীক্ষিত হওয়া

একজন মানুষের পুরো জীবন নিরীক্ষণ করে যদি যুক্তিসংগতভাবে পুরস্কার বা শাস্তি দিতে হয়, তবে তার দিন ও রাত এবং প্রকাশ্য ও গোপনে করা সকল কর্মকাণ্ডকে নিরীক্ষণ করতে হবে। তা না হলে তার সকল কাজকে মূল্যায়ন করা হবে না।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থান–

মানব রচিত আইন

মানব রচিত আইনে আইন মানা বা না মানার বিষয়টি নিরীক্ষণ করা হয় মানুষ দিয়ে গঠিত সরকারের বিভিন্ন সংস্থার (পুলিশ, গোয়েন্দা ইত্যাদি) মাধ্যমে। ঐ সকল সংস্থার সদস্যদের মাধ্যমে একটি দেশের সকল মানুষের দিন ও রাত, প্রকাশ্য ও গোপন সকল কর্মকাণ্ড নিখুঁতভাবে নিরীক্ষণ করা অসম্ভব। তাই পৃথিবীর কোনো সরকার বা সংস্থা তা করতে পারার দাবিও করে না।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনের প্রণেতা জানিয়ে দিয়েছেন– তাঁর সরকার মানুষকে পুরস্কার বা শাস্তি দিবে দুটো স্তরে, প্রাথমিক ও চূড়ান্ত। প্রাথমিক স্তর হবে দুনিয়ায়। আর চূড়ান্ত স্তর হবে দুনিয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পর পরকালে। তিনি আরও ঘোষণা করেছেন– প্রথম স্তরের বিচারে নিরীক্ষণ ও বিচার করবে মানুষ। কিন্তু চূড়ান্ত স্তরের বিচারের জন্য মানুষের সকল কর্মকাণ্ড নিরীক্ষণ করবে তাঁর নিয়োগকৃত কর্মচারীরা (ফেরেশতারা)। আর ঐ স্তরে বিচার করবেন তিনি নিজে।

প্রাথমিক স্তরে নিরীক্ষণ করবে মানুষ। তাই কুরআনের আইনের প্রাথমিক স্তরের নিরীক্ষণে দিন ও রাত, প্রকাশ্য ও গোপনে করা সকল কর্মকাণ্ডকে নিরীক্ষণ করার দৃষ্টিকোণ থেকে দুর্বলতা থাকবে। তবে তা মানব রচিত আইনের তুলনায় কম হবে। কারণ, নিরীক্ষণে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরকালের জবাবদিহিতার ভয় থাকবে। কিন্তু চূড়ান্ত বিচারের জন্য যে নিরীক্ষণ করা হবে তাতে কোনো দুর্বলতা থাকবে না।

চূড়ান্ত বিচারের তথ্য সংগ্রহের স্থান, কাল ও পাত্রের বিস্তৃতির ব্যাপারে কুরআনের আইন প্রণেতার অনেক বক্তব্যের দুটি হলো–

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَۙ . كِرَامًا كَاتِبِيْنَۙ . يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ .

অনুবাদ : আর অবশ্যই তোমাদের ওপর রয়েছে তত্ত্বাবধায়কগণ। (যারা) সম্মানিত লেখক (নিরীক্ষক)। তারা জানে (নিরীক্ষণ করে) তোমরা (দিন ও রাত, প্রকাশ্য ও গোপনে) যা করো।

(সুরা ইনফিতার/৮২ : ১০-১২)

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَ مَا تُعْلِنُوْنَ .

অনুবাদ : তোমরা যা গোপন রাখো এবং যা প্রকাশ করো আল্লাহ সে সব জানেন।

(সুরা নাহল/১৬ : ১৯)

♣♣ তাহলে দেখা যাচ্ছে মানুষের দিন ও রাত, প্রকাশ্য ও গোপনে করা সকল কর্মকাণ্ডকে নিরীক্ষণ করার দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআনের আইন সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত। কিন্তু মানুষের আইন তা মোটেই নয়।

২. বাহ্যিক কাজের সাথে মনের অবস্থাও (Motive) নিরীক্ষণ করা

কৃত কাজের জন্য মানুষকে সুবিচার করে পুরস্কার বা শাস্তি দিতে হলে কাজটি করার সময় তার মনের অবস্থা কী ছিল তা সঠিকভাবে জানা একান্তভাবেই দরকার। অর্থাৎ সে ইচ্ছাকৃতভাবে কাজটি করেছে, না দুর্ঘটনাবশত কাজটি হয়ে গেছে, তা জানা খুবই দরকার। কারণ, ইচ্ছাকৃতভাবে করা কাজের পুরস্কার বা শাস্তি এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে বা দুর্ঘটনাবশত ঘটে যাওয়া কাজের পুরস্কার বা শাস্তি কখনই সমান হতে পারে না।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থা–

মানব রচিত আইন

মানুষের মনের অবস্থা নিরীক্ষণ করার মতো কোনো প্রযুক্তি পূর্বে মানব সভ্যতার জানা ছিল না। বর্তমানে আবিষ্কার হয়েছে এবং এখনো সেটি প্রাথমিক স্তরে। ভবিষ্যতে এটি উন্নত হলেও তা দিয়ে সকল মানুষের প্রতিটি কাজ করার সময় মনের অবস্থা কী ছিল তা নিরীক্ষণ করা কোনোভাবেই সম্ভব হবে না। তাই মানব রচিত আইনে বিচারের সময় মনের অবস্থা সঠিকভাবে যাচাই করে সুবিচার করা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না এবং ভবিষ্যতে হওয়ার সম্ভাবনাও কম।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনে দুনিয়ার বিচারের সময় মানুষের মনের অবস্থা পর্যালোচনা করে সুবিচার করার ব্যাপারে মানব রচিত আইনের মতো দুর্বলতা থাকবে। কিন্তু চূড়ান্ত বিচারের (পরকালীন বিচার) সময় ঐ ব্যাপারে কোনো দুর্বলতা থাকবে না। কারণ, পরকালীন বিচারে, প্রতিটি কাজের সময় মানুষের মনের অবস্থা কী ছিল সেটি নিখুঁতভাবে পর্যালোচনা করা হবে। আর প্রতিটি কাজের সময় মানুষের মনের অবস্থা নিরীক্ষণ করা হচ্ছে এটি কুরআনের আইনের প্রণেতা আল কুরআনের বহুস্থানে জানিয়ে দিয়েছেন। সে বক্তব্যের কয়েকটি হলো নিম্নরূপ–

يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ ۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ .

অনুবাদ : আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন, তোমরা যা গোপন করো ও যা প্রকাশ করো সবই তিনি জানেন। আর আল্লাহ সম্মুখ ব্রেইনের (সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনের) সবকিছু জানেন।

(সুরা তাগাবুন/৬৪ : ৪)

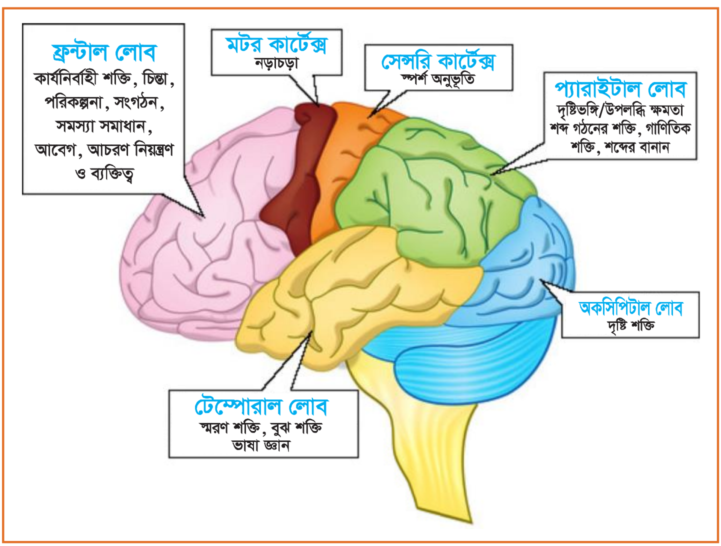

ব্যাখ্যা : কুরআনের আইনের প্রণেতা এখানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে–

১. মহাকাশ ও পৃথিবীর সকল কিছুর জ্ঞান তাঁর আছে।

২. মানুষের প্রকাশ্য ও গোপনে করা সকল কাজ তিনি জানেন বা জানতে পারেন।

৩. প্রতিটি কাজের সময় মানুষের মনের অবস্থা কী ছিল তাও তিনি জানেন তথা নিরীক্ষণ করেন বা নিরীক্ষণের মাধ্যমে জানতে পারেন।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ .

অনুবাদ : আর তারা সম্মুখ ব্রেইন (সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে) যা গোপন রাখে এবং যা প্রকাশ করে তা তোমার রব অবশ্যই জানেন।

(সুরা নামল/২৭ : ৭৪)

... ... وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ؕ فَيَغْفِرُ

لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ... ...

অনুবাদ : ... ... আর তোমাদের মনে যা আছে তা তোমরা প্রকাশ করো অথবা গোপন রাখো আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন। অতঃপর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন (আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী যে ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য সে ক্ষমা পাবে এবং শাস্তি পাওয়ার যোগ্য সে শাস্তি পাবে)। ... ...

(সুরা বাকারা/২ : ২৮৪)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এখানে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন– দুনিয়ায় কাজ করার সময় মানুষের মনের অবস্থা (Motive) কী ছিল তা তার গোয়েন্দারা (ফেরেশতা) নিরীক্ষণ করছে ও রেকর্ড করে রাখছে। চূড়ান্ত বিচারের দিন ঐ সকল রেকর্ড পর্যালোচনার মাধ্যমে বিচার করে তিনি পুরস্কার ও শাস্তি নির্ধারণ করবেন।

এভাবে কুরআনের আরও অনেক জায়গায় বলা হয়েছে যে– প্রতিটি কাজ করার সময় মানুষের মনের অবস্থাও আল্লাহ নিরীক্ষণ করাচ্ছেন বা করছেন।

♣♣ তাহলে নিরীক্ষণ ব্যবস্থার আলোচ্য দৃষ্টিকোণ (মনের অবস্থা নিরীক্ষণের দৃষ্টিকোণ) থেকেও মানব রচিত আইন যুক্তিসংগত নয় কিন্তু কুরআনের আইন যুক্তিসংগত।

৩. নিরীক্ষণের পদ্ধতি নিখুঁত হওয়া

নিরীক্ষণের পদ্ধতিটি অবশ্যই নিখুঁত হতে হবে। অর্থাৎ পদ্ধতিটি এমন হতে হবে যে–

১. বিচারের সময় নিরীক্ষণের রেকর্ডটি পর্যালোচনা করে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে বিচারকের কোনো অসুবিধা না হয়।

২. যে ব্যক্তি বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো থাকবে, রেকর্ডটি দেখার পর তারও যেন এটি বলার কোনো সুযোগ না থাকে যে, কাজটি সে করেনি বা কথাটি সে বলেনি।

নিরীক্ষিত বিষয়টি কোনো কিছুতে লিখে রেখে এবং সে লেখা উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করে বা সাক্ষী উপস্থাপনের মাধ্যমে বিচার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে, ঐ দুটো শর্ত শতভাগ পূরণ নাও হতে পারে। অর্থাৎ বিচারক সঠিক সিদ্ধান্তে আসার ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চয়তা নাও পেতে পারে বা অপরাধী তথ্যটি সত্য নয় বলে দাবিও করতে পারে।

মানব সভ্যতার বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী নিরীক্ষণের যে পদ্ধতি, উপরোক্ত দুটো শর্ত শতভাগ পূরণ করতে পারবে তা হচ্ছে, ভিডিও নিরীক্ষণ পদ্ধতি। অর্থাৎ ঐ শর্ত পূরণ করে বিচার করতে হলে প্রতিটি মানুষের ২৪ ঘণ্টার সকল কর্মকাণ্ড ভিডিও'র মাধ্যমে রেকর্ড করে রাখতে হবে এবং বিচারের সময় সেই ভিডিও রেকর্ড পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্তে আসতে হবে। তাহলে বিচারক যেমন শতভাগ নিশ্চয়তাসহকারে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারবেন। তেমনি অপরাধী ব্যক্তির পক্ষে কাজটি করেনি বলে টু শব্দটি করারও অবকাশ থাকবে না।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থান–

মানব রচিত আইন

পৃথিবীর কোনো সরকারি সংস্থার পক্ষে সকল মানুষের ২৪ ঘণ্টার প্রকাশ্য ও গোপন সব কর্মকাণ্ড ভিডিও রেকর্ডের মাধ্যমে নিরীক্ষণ করা অসম্ভব ব্যাপার।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনে প্রাথমিক স্তরের (দুনিয়ার) বিচারের জন্যও সকল মানুষের ২৪ ঘণ্টার কর্মকাণ্ড ভিডিও রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষণ করা সম্ভব নয়। কারণ, সেখানেও নিরীক্ষণকারীরা হবে মানুষ। কিন্তু কুরআনের আইনের চূড়ান্ত বিচারের জন্য সকল মানুষের ২৪ ঘণ্টার সকল কর্মকাণ্ড ভিডিও রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষণ করা হচ্ছে। বিষয়টি কুরআনের আইনের প্রণেতা এভাবে জানিয়ে দিয়েছেন–

وَاِنَّ عَلَيۡكُمۡ لَحٰفِظِيۡنَۙ . كِرَامًا كَاتِبِيۡنَۙ . يَعۡلَمُوۡنَ مَا تَفۡعَلُوۡنَ .

অনুবাদ : আর অবশ্যই তোমাদের ওপর রয়েছে তত্ত্বাবধায়কগণ। (যারা) সম্মানিত লেখক (নিরীক্ষক)। তারা জানে (নিরীক্ষণ করে) তোমরা (দিন ও রাত, প্রকাশ্য ও গোপনে) যা করো। (সুরা ইনফিতার/৮২ : ১০-১২)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির ব্যাখ্যায় পূর্বের তাফসীরকারকরা লিখেছেন– মানুষের ২৪ ঘণ্টার কর্মকাণ্ড ফেরেশতারা লিখে রাখবেন। ঐ 'লেখা আমলনামা' পরকালে মানুষকে পড়তে দেওয়া হবে এবং তার ভিত্তিতে বিচার করে পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়া হবে।

মানব সভ্যতার পূর্বের জ্ঞান অনুযায়ী 'লেখা' শব্দটার একমাত্র অর্থ হতো কলমের সাহায্যে কোনো কিছুর ওপর হাত দিয়ে লেখা। তাই পূর্বের তাফসীরকারকদের করা আয়াতসমূহের ঐ ব্যাখ্যা তখন সঠিক ছিল। কিন্তু বর্তমানে আমরা জানি– পিন (Pin), আলোক রশ্মি (Light ray), লেজার রশ্মি (Laser ray) বা শব্দের প্রকম্পনের (Sound wave) মাধ্যমে ভিডিও টেপ (Video tape), কম্পিউটার ডিস্ক (Computer disk) ইত্যাদির ওপর দাগ (Impression) কাটাও (রেকর্ড করা) এক ধরনের লেখা।

তাই মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী আয়াতগুলোর অর্থ হবে– 'সকল মানুষের জন্য তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত রয়েছেন। সে সম্মানিত তত্ত্বাবধায়কগণ মানুষের ২৪ ঘণ্টার সকল কর্মকাণ্ড ভিডিও পদ্ধতিতে রেকর্ড করে রাখছেন।

কুরআনের নিম্নের তথ্য দুটি এ ব্যাখ্যাকেই সমর্থন করে–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ . إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ . مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ .

অনুবাদ : আর নিশ্চয় আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমরা জানি। আর আমরা তার ঘাড়ের ধমনীর চেয়েও অধিক নিকটতর। যখন (সর্বক্ষণ) দুজন সংগ্রহকারী (ফেরেশতা) ডানে এবং বামে বসে (তথ্য) সংগ্রহ করছে। সে যে কথাই উচ্চারণ করুক (তা সংরক্ষণের জন্য) তার কাছে থাকে একজন সদাপ্রস্তুত পর্যবেক্ষক।

(সুরা ক্বফ/৫০ : ১৬-১৮)

ব্যাখ্যা : কুরআনের আইনের প্রণেতা এখানে–

- প্রথমে বলেছেন, মানুষের মনের কথা তিনি জানেন বা জানতে পারেন।
- তারপর বলেছেন, তিনি বা তার কর্মচারীরা সর্বক্ষণ মানুষের চারপাশে অতি নিকটবর্তী অবস্থানে আছেন।
- সবশেষে তিনি বলেছেন, দুজন ফেরেশতা মানুষের সাথে সর্বদা থাকেন এবং তারা মানুষের সকল কথা সংরক্ষণ করছেন।

লক্ষণীয় হচ্ছে– আল্লাহ এখানে ফেরেশতাদের সংরক্ষণ পদ্ধতি কী হবে সেটি নির্দিষ্ট করে না বলে উন্মুক্ত (Open) রেখেছেন। সুতরাং মানব সভ্যতার বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী বলা যায়– সেই সংরক্ষণ পদ্ধতি হবে ভিডিও রেকর্ডিং।

কারণ, আল্লাহ নিশ্চয় সবচেয়ে উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে কাজের রেকর্ড সংগ্রহ করবেন। আর কলম দিয়ে লেখা থেকে ভিডিও রেকর্ডিং যে অনেক অনেক উন্নত পদ্ধতি, তাতো বলার অপেক্ষা রাখে না।

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ؕ . فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ؕ . وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ .

অনুবাদ : সেদিন (কিয়ামতের দিন) মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হয়ে সম্মুখে অগ্রসর হবে যাতে তাদেরকে (বিচারের সাক্ষী-প্রমাণ হিসাবে) তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়। কেউ অণু পরিমাণ ভালো কাজ করলে সে তা দেখতে পাবে। আবার কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করলে সেও তা দেখতে পাবে।

(সুরা যিলযাল/৯৯ : ৬-৮)

ব্যাখ্যা : আয়াতগুলোতে কুরআনের আইনের প্রণেতা 'পড়া' বা 'শুনা' শব্দ ব্যবহার না করে 'দেখা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাই ওপরে বর্ণিত সুরা ইনফিতারের ১০-১২ নং এবং সুরা ক্বফের ১৬-১৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যার সাথে এ আয়াত তিনটির বক্তব্য সমন্বয় করলে নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায়, কুরআনের আইনের প্রণেতা এখানে বলেছেন– মানুষের ২৪ ঘণ্টার সকল কাজ তাঁর গোয়েন্দা কর্মচারীরা ভিডিও পদ্ধতিতে রেকর্ড করে সংরক্ষণ করছেন। চূড়ান্ত বিচারের দিন ঐ ভিডিও রেকর্ড বিচারের তথ্য-প্রমাণ হিসেবে সকলকে দেখানো হবে।

♣♣ তাই সহজে বলা যায়– মানুষের দুনিয়ার কর্মকাণ্ড নিরীক্ষণের পদ্ধতির দৃষ্টিকোণ থেকেও কুরআনের আইন শতভাগ যুক্তিসংগত কিন্তু মানব রচিত আইন তা নয়।

৪. চালু থাকা বিষয়গুলোকে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার দিন পর্যন্ত নিরীক্ষণ করা

অনেক কাজ/বিষয় আছে যা চালু থাকে। যেমন– বই, মসজিদ, মাদ্রাসা, জুয়ার ঘর (Casino), সিনেমা হল ইত্যাদি। এ সকল বিষয়/কাজের জন্য কাউকে পরিপূর্ণ পুরস্কার বা শাস্তি দিতে হলে যতদিন ঐ কাজ/বিষয়টা চলতে থাকবে, ততদিনের ফলাফলকে হিসাবে আনতে হবে। আর এ জন্য দরকার, ঐ ধরনের কাজ বা বিষয় ততদিন পর্যন্ত নিরীক্ষণ করা যতদিন তা চলতে থাকবে। অর্থাৎ ঐ ধরনের সকল কাজকে নিরীক্ষণ করতে হবে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত। এটি করতে হলে যে সত্তা নিরীক্ষণ করবে, তাকে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত জীবিত থেকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। আর পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার সময়ে এবং পরেও তাকে এবং তার নিরীক্ষণের রেকর্ড অক্ষত থাকতে হবে।

এ ব্যাপারে উভয় আইনের অবস্থান–

মানব রচিত আইন

মানব রচিত আইনে যে সরকার এবং যে কর্মচারীরা নিরীক্ষণ করবে, তারা উভয়েই মরণশীল বা ক্ষণস্থায়ী। আর দুনিয়া ধ্বংস হয়ে গেলে তার বা তাদের নিরীক্ষণ ধারণকারী বস্তুটিও ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই মানব রচিত আইনে এ শর্ত পূরণ হওয়া সম্ভব নয়।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনে প্রাথমিক (দুনিয়ার) বিচারের জন্য যারা নিরীক্ষণের দায়িত্বে থাকবে তারা মানুষ। কিন্তু চূড়ান্ত বিচারের জন্য নিরীক্ষণের দায়িত্বে যারা নিযুক্ত আছেন তারা ফেরেশতা। ফেরেশতারা পৃথিবী ধ্বংসের সময় (কিয়ামতের সময়) এবং ধ্বংস হওয়ার পরও বেঁচে থাকবে। ঐ নিরীক্ষকদের পক্ষে তাই চলতে থাকা কাজ বা বিষয়গুলোকে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত নিরীক্ষণ করা এবং তা সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে।

♣♣ তাই কুরআনের আইন, আইন যুক্তিসংগত হওয়ার এ শর্তটিও পূর্ণ করতে পারবে। কিন্তু মানব রচিত আইনের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

মানদণ্ড-৩.৫
বিচারের সময় জন্মগতভাবে সুযোগ-সুবিধা বেশি বা কম পাওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় আনা

আইন জানা ও মানার সাথে সম্পর্কিত সুযোগ-সুবিধা যদি কোনো ব্যক্তি জন্মগতভাবে বেশি বা কম পেয়ে থাকে তবে আইন মানা বা না মানার ভিত্তিতে বিচার করে পুরষ্কার বা শাস্তি দেওয়ার সময় সেটি বিবেচনায় আনতে হবে। এটি না আনলে ঐ বিচার ন্যায়বিচার হবে না। কারণ জন্মের স্থান ও কালের ব্যাপারে মানুষের কোনো হাত নেই।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থান–

মানব রচিত আইন

মানব রচিত আইনে সাধারণত এটি বিবেচনায় আনা হয় না। যেমন– মানব রচিত আইনে ধনীর ঘরে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তি অধিক বিলাসবহুল জীবনযাপন করার জন্য চুরি করলে যে শাস্তি, গরীবের ঘরে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তি পেটের দায়ে চুরি করলেও একই শাস্তি।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনে দুনিয়া ও পরকাল, উভয় স্থানের বিচারেই এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে। জন্মগতভাবে বেশি বা কম পাওয়া সকল বিষয় সেখানে বিবেচনায় আনা হবে।

জন্মগতভাবে বেশি বা কম পাওয়া বিষয়সমূহ যা হতে পারে–

১. সম্পদ বেশি বা কম পাওয়া।
২. মেধা শক্তি বেশি বা কম পাওয়া।
৩. আরবী ভাষা জানার সুযোগ বেশি বা কম পাওয়া।
৪. লেখা-পড়ার সুযোগ বেশি বা কম পাওয়া।
৫. স্মরণশক্তি বেশি বা কম পাওয়া।
৬. শরীরের গঠন ও গায়ের রং ভালো বা খারাপ হওয়া।
৭. ইত্যাদি।

উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়– কুরআনের আইনে দুনিয়ার বিচারে ধনীর ঘরে জন্মগ্রহণ করার কারণে জন্মসূত্রে ধনী হওয়া ব্যক্তি চুরি করলে তার হাত কাটা হবে। কিন্তু গরীবের ঘরে জন্ম হওয়ার কারণে পেটের দায়ে চুরি করলে তার কোনো শাস্তি নেই।

তবে দুনিয়ার বিচারের তথ্যের দুর্বলতা এবং বিচারকের বিচক্ষণতার অভাবে এ দৃষ্টিকোণ থেকে সবার ব্যাপারে শতভাগ সুবিচার করা সাধারণত সম্ভব হয় না। কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে (পরকালীন বিচার) এ বিষয়টি নিখুঁতভাবে বিবেচনায় এনে সকলকে চূড়ান্তভাবে পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়া হবে।

এ কথাটিই কুরআনের আইনের প্রণেতা নিম্নোক্তভাবে জানিয়ে দিয়েছেন–

তথ্য-১

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَآ اٰتٰىكُمْ ط ... ...

অনুবাদ : তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং তিনি (জন্মগতভাবে) তোমাদের একজনকে অন্যজন হতে (বিভিন্ন দিক দিয়ে) অধিক মর্যাদা (সুযোগ-সুবিধা) দিয়েছেন, যেন যাকে যা দেওয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে তোমাদের পরীক্ষা (বিচার) করতে পারেন। ... ...

(সুরা আন'আম/৬ : ১৬৫)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এখানে জানিয়েছেন– জন্মগত কারণে কোনো ব্যক্তি ইসলাম জানা ও মানার ব্যাপারে সুযোগ-সুবিধা বেশি বা কম পেয়ে থাকলে পরকালের বিচারে তা বিবেচনায় এনেই তিনি বিচার করবেন এবং পুরস্কার বা শাস্তি দেবেন। এ সুযোগ-সুবিধা পূর্বে বর্ণিত সুযোগ-সুবিধার যেকোনোটি হতে পারে।

তথ্য-২.১

... ...وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا .

অনুবাদ : ... ... আর আমরা রসূল (বার্তাবাহক) না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেই না। (সুরা বনী-ইসরাইল/১৭ : ১৫)

তথ্য-২.২

وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ .

অনুবাদ : আর আমরা এমন কোনো জনপদ ধ্বংস করিনি যার জন্য সতর্ককারী ছিল না। (সুরা শু'য়ারা/২৬ : ২০৮)

তথ্য-২.৩

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ .

অনুবাদ : এটি (দ্বীন জানিয়ে দেওয়া) এ জন্য যে, তোমার রব কোনো জনপদকে (তার আদেশ সম্পর্কে) অনবহিত থাকা অবস্থায় ধ্বংস করার মতো একটি জুলুম করেন না। (সুরা আন'আম/৬ : ১৩১)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এ ৩টি আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ইসলামের দাওয়াত না পৌঁছিয়ে তিনি কোনো ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীকে ইসলামের বিধি-বিধান অমান্য করার কারণে শাস্তি দেবেন না।

অর্থাৎ মহান আল্লাহ এখানে জানিয়ে দিয়েছেন– জন্ম স্থানের কারণে যে ব্যক্তি ইসলাম জানতে পারেনি এবং যে ব্যক্তি ইসলাম সহজে জানতে পেরেছে, উভয় ব্যক্তির ইসলামের বিধি-বিধান অমান্য করার কারণে পরকালে পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়ার মানদণ্ড ভিন্ন হবে। প্রথম গ্রুপের মানদণ্ড দ্বিতীয় গ্রুপের মানদণ্ডের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সহজ হবে।

♣♣ তাই সহজে বলা যায়, এ মানদণ্ডের দৃষ্টিকোণ থেকেও কুরআনের আইন শতভাগ যুক্তিসংগত কিন্তু মানব রচিত আইন তা নয়।

মানদণ্ড-৩.৬
ওকালতি ও সাক্ষী ব্যবস্থার ধরন

ওকালতি ও সাক্ষী প্রথা বিচার ব্যবস্থার একটি অংশ। তাই, ওকালতি ও সাক্ষী প্রথা উভয় আইনেই আছে। তবে তার ধরন ও ব্যাপ্তিতে পার্থক্য আছে। ওকালতি ও সাক্ষী প্রথার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো– সঠিক বিচার করার জন্য তথ্য-প্রমাণ দিয়ে বিচারককে সহায়তা করা।

এ মানদণ্ডের দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের পর্যালোচনা–

দুনিয়ার বিচার

মানব রচিত আইন

মানব রচিত আইনের ওকালতি প্রথায় দেখা যায় একজন উকিল, অপরাধী জেনেও তার মক্কেলের যাতে মোটেই বা কম শাস্তি হয় সে ব্যাপারে বিচারককে বিভ্রান্ত করার জন্য নানা ধরনের চেষ্টা করে। অনেক ক্ষেত্রে বিচারক এভাবে বিভ্রান্ত হয়েও যায়। আবার সাক্ষীরাও নিজ স্বার্থে নানা ধরনের মিথ্যা সাক্ষী দিয়েও বিচারককে বিভ্রান্ত করে।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনে উকিল ও সাক্ষীদেরকে সত্যকে মিথ্যার আবরণে ঢাকতে বা মিথ্যাকে সত্যের আবরণে ঢাকতে এবং মিথ্যা সাক্ষী দেওয়াকে নানাভাবে কঠোর ভাষায় নিষেধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আল কুরআনের দুটি বক্তব্য–

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ .

অনুবাদ : আর তোমরা সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢেকোনা এবং জেনে-শুনে সত্যকে গোপন করো না।

(সুরা বাকারা/২ : ৪২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের আইনের প্রণেতা এখানে সকল মানুষকে, যার মধ্যে উকিল (Advocate) ও সাক্ষীরাও অন্তর্ভুক্ত, সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢাকতে অর্থাৎ মিথ্যা সাক্ষী দিতে এবং জানা থাকা সত্ত্বেও সত্যকে গোপন করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰۤى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۫ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰۤى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗۤا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا .

অনুবাদ : হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহর সাক্ষী হিসাবে ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। সে বিত্তবান অথবা বিত্তহীন যাই হোক আল্লাহ দুজনেরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে গিয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলো অথবা (সত্যকে) এড়িয়ে চলো তবে আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত। (সুরা নিসা/৪ : ১৩৫)

♣♣ কুরআনের আইনে, এক ব্যক্তি অপরাধ করেছে তা জানা বা বুঝা সত্ত্বেও ওকালতি বা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে বিচারককে বিভ্রান্ত করা একটি বড়ো অপরাধ। এ অপরাধ প্রমাণিত হলে উকিল বা সাক্ষীদের দুনিয়াতেই শাস্তি পেতে হবে। আর দুনিয়ার শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে গেলেও পরকালের শাস্তি থেকে তারা কোনোমতেই রেহাই পাবে না। এ জন্য দুনিয়ার বিচারে কুরআনের আইনের ওকালতি ও সাক্ষ্য ব্যবস্থা, বিচারককে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে, মানব রচিত আইনের তুলনায় বেশি সহায়ক হবে।

পরকালীন বিচার

মানব রচিত আইন

মানব রচিত আইনে পরকালীন বিচার নেই। তাই এ আইনে পরকালীন বিচারের ওকালতি বা সাক্ষীর ব্যবস্থা থাকা বা না থাকার কোনো প্রশ্নই আসে না।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনে পরকালীন বিচারে ওকালতি আছে। ঐ ওকালতির নাম হলো 'শাফায়াত'।

পরকালে শাফায়াতের যে নিয়ম-কানুন হবে তা হলো–

১. শাফায়াত করার যোগ্যতা

প্রথমে শাফায়াতকারীকে শাফায়াত করার জন্য আল্লাহর কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। অনুমতি নেওয়ার বিধান থেকেই বোঝা যায় যে, সবাই শাফায়াতের অনুমতি পাবে না। অনুমতি পাবে নবী-রসূলগণ ও অতি উচ্চমানের নেক্কার মু'মিনগণ, যারা সঠিক জ্ঞানের ভিত্তিতে কথা ও কাজের মাধ্যমে দুনিয়ায় ইসলামের সাক্ষ্য দিয়েছেন।

২. শাফায়াত পাওয়ার যোগ্যতা

শাফায়াতের মাধ্যমে কবীরা (বড়ো) গুনাহ মাফ হবে না। কবীরা গুনাহ মাফ হওয়ার একমাত্র উপায় হলো 'তাওবা'। আর সে তাওবা করতে হবে

মৃত্যুর যুক্তিসংগত সময় পূর্বে। অর্থাৎ মৃত্যু আসার এমন সময় পূর্বে যখন ব্যক্তির গুনাহর কাজ করার ক্ষমতা আছে কিন্তু তাওবা করেছে বলে সে গুনাহর কাজ করছে না। শাফায়াতের মাধ্যমে মাফ হবে শুধু ছগীরা ও মধ্যম (না ছগীরা ও না কবীরা) গুনাহ।

অর্থাৎ পরকালে যাদের আমলনামায় কবীরা গুনাহ থাকবে তাদের জন্য শাফায়াত কোনো কাজে আসবে না। শাফায়াত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে- **'শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?'** (গবেষণা সিরিজ-১৬) নামক বইটিতে।

মানদণ্ড-৩.৭
দুনিয়ার বিচারে শাস্তির ধরন

আইন অমান্য করার জন্য শাস্তির বিধান সকল আইনে আছে। শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো−

১. অন্য মানুষ যেন সন্দেহাতীতভাবে জানতে ও বুঝতে পারে যে, ঐ ধরনের অপরাধ করলে কী ধরনের শাস্তি হয়। আর এর ফলস্বরূপ আশা করা হয় সমাজের অন্য মানুষেরা ঐ ধরনের অপরাধ করা থেকে বিরত থাকবে।
২. যে শাস্তি পেল সে যাতে আর ঐ ধরনের অপরাধ করার সাহস না পায়।

শাস্তি দেওয়ার এ দুটো উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রথমটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও কল্যাণকর। কারণ−

১. যে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি পেল সেতো পুনরায় ঐ অপরাধ করার সুযোগ পাবে না।
২. যে শাস্তি পেল সেতো একজন ব্যক্তিমাত্র। কিন্তু ঐ অপরাধ করার মতো অসংখ্য ব্যক্তি সমাজে আছে। তাদেরকে ঐ অপরাধ হতে বিরত রাখতে পারলে সমাজের অধিক কল্যাণ হবে।

দুনিয়ার বিচারে শাস্তি দেওয়ার অত্যন্ত যুক্তিসংগত ঐ দুটো উদ্দেশ্য পূরণ হতে হলে, সে শাস্তিকে নিম্নের শর্তগুলো অবশ্যই পূরণ করতে হবে−

১. শাস্তি দেয়ার সময় অপরাধী নয়, সাধারণ মানুষের কল্যাণের দিকে বেশি দৃষ্টি দিতে হবে : শাস্তির ধরন ও প্রয়োগ পদ্ধতি নির্ণয় করার সময় অপরাধী ব্যক্তির প্রতি মায়া, মমতা বা শ্রদ্ধা দেখানোর চেয়ে

সাধারণ মানুষের কল্যাণের দিকে বেশি খেয়াল রাখতে হবে। কারণ অপরাধীর প্রতি মায়া, মমতা বা শ্রদ্ধা দেখাতে গেলে শাস্তির ধরন ও প্রয়োগ হয়ে যাবে এমন যা অন্যদের বা অপরাধীকে ঐ অপরাধ করা থেকে দূরে রাখতে ব্যর্থ হবে। অর্থাৎ অপরাধীর প্রতি দয়া দেখানোর অর্থ হচ্ছে অনেক নিরপরাধ মানুষের শাস্তির ব্যবস্থা করা। এর ফলে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

২. শাস্তি হতে হবে দৃষ্টান্তমূলক : এটি না হলে ঐ শাস্তি দেখে মানুষ ভীত হবে না। তাই ঐ শাস্তি সমাজের অপরাধ প্রবণ মানুষকে অপরাধ করতে বা অপরাধীকে ঐ অপরাধ আবার করা থেকে বিরত রাখতে পারবে না। এর ফলেও শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।

৩. শাস্তি হতে হবে জনসমক্ষে : শাস্তি জনসমক্ষে হলে হাজার হাজার বা কোটি কোটি মানুষ তা নিজ চোখে দেখতে পায়। আর নিজ চোখে দেখলে শাস্তির ধরনটি নিশ্চিতভাবে বুঝা যায় এবং মনের ওপর ঐ শাস্তির যে প্রভাব পড়ে তার প্রচণ্ডতা, শাস্তির কথা পড়া বা শোনার মাধ্যমে জানার চেয়ে অনেক অনেক বেশি হয়। তাই জনসমক্ষে দেওয়া শাস্তি, শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য সাধনে অধিক ভূমিকা রাখে।

৪. সচরাচর ঘটা অপরাধের শাস্তি সদা দৃষ্টিগোচরমূলক হওয়া : সচরাচর ঘটা অপরাধের শাস্তি এমন হলে ভালো হয় যেন অপরাধী ব্যক্তিকে দেখলেই বুঝা যায় তাকে ঐ নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে। সকল সময় উন্মুক্ত থাকে অর্থাৎ সকল সময় দেখা যায় (দৃষ্টিগোচরমূলক), শরীরের এমন কোনো অঙ্গের বিকৃতি ঘটিয়ে শাস্তি দিলে তা শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য সাধনে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

ওপরের Common sense সম্মত দৃষ্টিকোণের আলোকে মানব রচিত আইন ও কুরআনের আইনের দুনিয়ার বিচারের পর্যালোচনা−

মানব রচিত আইন

শাস্তির ধরন ও প্রয়োগ পদ্ধতি স্থির করার সময় মানব রচিত আইনে অপরাধীর সম্মান, মর্যাদা, কষ্ট, মানবাধিকার ইত্যাদিকে অতিমাত্রায় গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর ফলস্বরূপ মানব রচিত আইনে−

১. অধিকাংশ শাস্তি লঘু হয় বা দৃষ্টান্তমূলক হয় না।

২. শাস্তি কার্যকর করা হয় লোকচক্ষুর অন্তরালে কারাগারের মধ্যে।

৩. সকল সময় উন্মুক্ত থাকে এমন কোনো অঙ্গ স্থায়ীভাবে বিকৃত করে শাস্তি দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই।

তাই, মানব রচিত আইনের শাস্তি তার উদ্দেশ্য সাধনে অর্থাৎ অপরাধ ঘটার মাত্রা কমাতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়। আর এর ফলে নিরপরাধ সাধারণ মানুষের কষ্ট বেড়ে যায় বা তাদের শান্তি, সম্মান, মর্যাদা ও মানবাধিকার বেশি লজ্ঘিত হয়। এটা কখনই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনের প্রণেতা তাঁর প্রণীত আইনে দুনিয়ার বিচারের শাস্তির ধরন ও প্রয়োগ পদ্ধতি নির্ধারণের সময় নিরপরাধ সাধারণ মানুষের কষ্ট, সম্মান, মর্যাদা, মানবাধিকার ইত্যাদিকে অপরাধীর কষ্ট, সম্মান, মর্যাদা, মানবাধিকার ইত্যাদির তুলনায় বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই, সেখানে শাস্তির ধরন ও প্রয়োগ পদ্ধতি ওপরে উল্লিখিত সকল শর্ত সুনিপুণভাবে পূরণ করেছে।

আল কুরআনে বর্ণিত শাস্তির সেই ধরন ও প্রয়োগ পদ্ধতির কয়েকটি হচ্ছে−

১. **শাস্তি জনসমক্ষে দেওয়া :** কুরআনের আইনের প্রণেতা অপরাধের শাস্তি, মানুষের সামনে অর্থাৎ প্রকাশ্যে দিতে বলেছেন। এটা তিনি সাধারণভাবে জানিয়ে দিয়েছেন অবিবাহিত লোকদের জেনা করার জন্য শাস্তির প্রয়োগ পদ্ধতির মাধ্যমে, এভাবে−

   ... ... وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

   অনুবাদ : ... আর মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।
   (সুরা নূর/ ২৪ : ২)

   ব্যাখ্যা : কুরআনের আইন প্রণেতা এখানে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, শাস্তি দিতে হবে প্রকাশ্যে। যাতে হাজার হাজার, লাখ লাখ বা কোটি কোটি মানুষ তা দেখতে পায়। কারণ শাস্তি দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা গড়ে ওঠার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। আর সে প্রতিবন্ধকতা সব থেকে বেশি গড়ে ওঠে নিজ চোখে শাস্তিটি দেখলে।

২. **শাস্তি দৃষ্টান্তমূলক হওয়া :** কুরআনের আইন প্রণেতা দৃষ্টান্তমূলকভাবে শাস্তি দিতে নির্দেশ দিয়েছেন এভাবে−

   وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۙ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ۙ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ... ... ...

   অনুবাদ : আর আমরা তাদের জন্য তাতে (তাওরাতে) বিধান দিয়েছিলাম যে− প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক,

কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। ... ...

(সুরা মায়েদা/৫ : ৪৫)

ব্যাখ্যা : কুরআনের আইন প্রণেতা এখানে বলেছেন, কুরআনের মতো তাওরাতেও তিনি (ইয়াহুদীদের জন্য) অপরাধের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার জন্য লিখে দিয়েছিলেন যে– কেউ যদি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে, কারো চোখ উঠিয়ে ফেলে, কারো কান কেটে দেয়, কারো দাঁত ভেঙে দেয় বা কাউকে যখম করে তবে সরকারিভাবে (ব্যক্তিগতভাবে নয়) বিচার করে তাকেও যথাক্রমে হত্যা করতে, চোখ উঠিয়ে ফেলতে, কান কেটে দিতে, দাঁত ভেঙে দিতে বা সমপরিমাণ যখম করে দিতে হবে।

৩. **শাস্তি দৃষ্টিগোচরমূলক হওয়া :** কুরআনের আইন প্রণেতা সচরাচর বা বেশি ঘটা অপরাধের শাস্তি দিতে বলেছেন, সহজে দেখা যায় এমন অঙ্গের বিকৃতি ঘটিয়ে–

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ .

অনুবাদ : পুরুষ চোর ও নারী চোর উভয়ের হাত কেটে দাও, এটি তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক (শিক্ষামূলক) শাস্তি। আর আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী ও মহাপ্রজ্ঞাময়।

(সুরা মায়েদা/৫ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : কুরআনের আইন প্রণেতা এখানে চুরির শাস্তি হিসেবে পুরুষ ও মহিলা উভয় চোরেরই হাত কেটে দিতে বলেছেন। এই শাস্তির প্রয়োগের ব্যাপারে রাসূল (স.) ও সাহাবায়ে কেরামদের কর্মনীতি পর্যালোচনা করলে চূড়ান্তভাবে যে তথ্য বের হয়ে আসে তা হলো– শুধু ধনী চোরদের এ শাস্তি দিতে হবে। গরিব চোর যারা অভাবে পড়ে চুরি করে তাদের এ শাস্তি দেওয়া যাবে না। বরং অভাবে পড়ে কেন তাকে চুরি করতে হলো সে জন্য তাদের শাসককে জবাবদিহি করতে হবে।

আয়াতটিতে আল্লাহ বলেছেন, শাস্তিটি একটি শিক্ষামূলক শাস্তি। অর্থাৎ শাস্তিটি তিনি চোর ও অন্য মানুষদের এ শিক্ষাটি প্রদানের জন্য দিয়েছেন যে– বিশেষ অভাব ছাড়া চুরি করলে তাকে নিশ্চিতভাবে এই শাস্তি পেতে হবে। আর একজন চোরের শাস্তি স্বচোক্ষে দেখার মাধ্যমে সকলে যাতে শিক্ষাটি পেতে পারে, সে জন্য সহজে দেখা যায় এমন একটি অঙ্গের স্থায়ী

বিকৃতি ঘটিয়ে শাস্তিটি দেওয়ার নির্দেশ তিনি দিয়েছেন। চোরটি যত দিন বেঁচে থাকবে ততদিন অসংখ্য মানুষ তাকে দেখে এ বাস্তব শিক্ষাটি পেতে থাকবে।

♣♣ তাহলে দেখা যাচ্ছে কুরআনের আইন দুনিয়ার বিচারে শাস্তির যে ধরন ও প্রয়োগ-পদ্ধতি নির্ণয় করে দিয়েছে, তা শাস্তি দেওয়ার যুক্তিসম্মত ও কল্যাণকর সকল উদ্দেশ্য সুনিপুণভাবে পূরণ করতে পারে। কিন্তু মানব রচিত আইন তা পারে না।

মানদণ্ড-৩.৮

শাস্তি থেকে কারো রেহাই না পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকা

আইন সার্বিক কল্যাণ বয়ে আনতে হলে অপরাধ করলে কেউ শাস্তি থেকে রেহাই না পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকতে হবে। তা না হলে অপরাধীরা অপরাধ করতে সাহস পাবে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থান–

মানব রচিত আইন

মানব রচিত আইনে যেহেতু বিচার হবে এক স্তরে এবং বিচারক ও তথ্য সংগ্রহকারীরা হবে মানুষ তাই সেখানে সকল অপরাধীকে ধরে বিচারের সম্মুখীন করা অসম্ভব।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনে দুনিয়ার বিচারের অংশে ঐ দুর্বলতা থাকলেও পরকালীন বিচারে কেউ শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না এটি শতভাগ নিশ্চিত।

তবে বহুল প্রচারিত একটি কথা বড়ো অপরাধীর (কবীরা গুনাহগার) সংখ্যা ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে দিয়ে মুসলিম দেশগুলোকে দারুণভাবে অশান্তিময় করেছে। **কথাটি হলো–** কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন ব্যক্তিরা কিছুকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করে চিরকালের জন্য জান্নাত পাবে। এ প্রচারণাটি কুরআন, সুন্নাহ ও আকলের স্পষ্ট বিরোধী। কুরআন, অনেক শক্তিশালী সহীহ হাদীস ও আকলের স্পষ্ট বিপরীত কয়েকটি সহীহ হাদীস দিয়ে এ ধ্বংশযজ্ঞ করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে– **'কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২০) নামক বইটিতে।

♣♣ তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকেও কুরআনের আইন অধিক যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর।

মানদণ্ড-৩.৯
পুরস্কারের ধরন

আইন মানতে উৎসাহিত করার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকা যুক্তিসংগত। আর সে পুরস্কারের মান এমন হওয়া উচিত যেন তার আশায় আইন মানতে গিয়ে কিছু কষ্ট হলেও মানুষ তা স্বীকার করে নিতে পারে।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় আইনের অবস্থান–

মানব রচিত আইন

আইন মানাকে উৎসাহিত করতে সকলের জন্য প্রযোজ্য কোনো ব্যাপক ও উৎকৃষ্ট পুরস্কারের ব্যবস্থা মানব রচিত আইনে নেই। যা আছে সেখানেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব বিরাটভাবে পরিলক্ষিত হয়।

কুরআনের আইন

কুরআনের আইনে দুনিয়ার বিচারের স্তরে মানব রচিত আইনের মতো এ বিষয়ে দুর্বলতা থাকলেও তা অপেক্ষাকৃত কম। তবে পরকালীন বিচারে তা পূরণ হয়ে যাবে। যারা দুনিয়ায় কুরআনের আইন মেনে চলবে তাদের সকলের জন্য পরকালের অনন্ত জীবনে অপরূপ পুরস্কারের ঘোষণা রয়েছে। ঐ পুরস্কারের আশায় আইন মানার কারণে কষ্ট হলেও তা স্বীকার করে নেওয়া মোটেই অযৌক্তিক নয়। আর অসংখ্য মানুষ ঐ পুরস্কারের আশায় অকল্পনীয় কষ্ট মেনে নিয়েছে এমনকি জীবনও দিয়ে দিয়েছে তার প্রমাণ ইতিহাসে ভূরিভূরি।

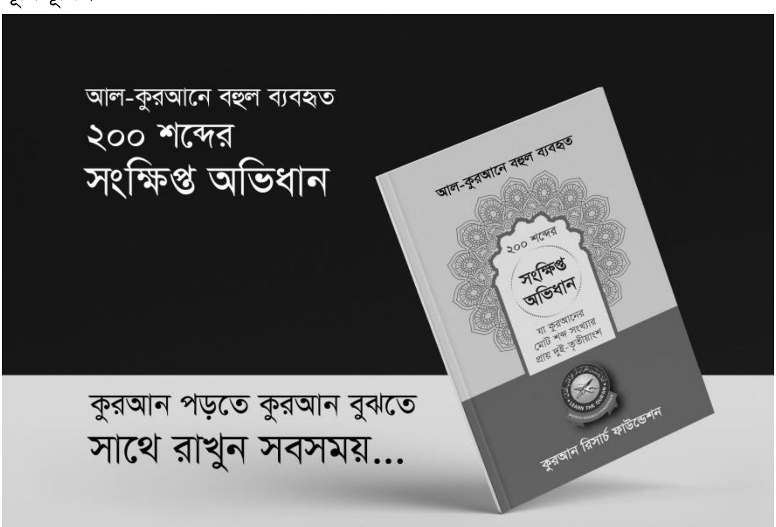

শেষ কথা

সুধী পাঠক, ওপরের তথ্যগুলো জানার পর আশা করি এ ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করবেন না যে– কুরআনের আইন সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর কিন্তু মানব রচিত আইন তার ধারে কাছেও নেই। আর কুরআনের আইন যে মানুষের সমাজকে অপূর্বভাবে কল্যাণময় বা শান্তিময় করতে পারে, তার বাস্তব কয়েকটি প্রমাণ হলো–

ক. রাসূল (স.) ও খোলাফায়ে রাশেদার যুগ

রাসূল (স.)-এর মদিনা শরীফে হিজরাতের পর থেকে পৃথিবীতে কুরআনের আইনের বাস্তব প্রয়োগ শুরু হয়। ঐ সময় থেকে খোলাফায়ে রাশেদার যুগ পর্যন্ত পৃথিবী কুরআনের আইন পুরোপুরি চালু থাকার সুফল দেখেছে। ঐ সময় মানব সমাজ কী অপূর্ব শান্তিময় ছিল নিম্নের কয়েকটি তথ্যই তার উৎকৃষ্ট দলিল–

১. রাষ্ট্র প্রধানের (হযরত ওমর রা.) নিজে ঘুরে ঘুরে সাধারণ নাগরিকদের অবস্থা দেখা এবং একজনের ঘরে গম নেই দেখে রাষ্ট্রীয় খাদ্য গুদাম থেকে নিজ পিঠে করে গম বয়ে নিয়ে নাগরিকের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া।

২. সাধারণ নাগরিকদের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপ্রধানকে (খলিফা) জনসমক্ষে সরাসরি জিজ্ঞাসা করা– 'সরকারের দেওয়া কাপড় তাদের (নাগরিকদের) তুলনায় অধিক তিনি কীভাবে পেলেন?' আর রাষ্ট্রপ্রধানের (হযরত ওমর রা.) অসন্তুষ্ট না হয়ে সে প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া।

৩. তৎকালীন গরিব আরব দেশ, কুরআনের আইন চালু হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যে এতটা ধনী হয়ে যায় যে, যাকাত নেওয়ার মতো গরিব লোক সেখানে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

৪. যুদ্ধের ময়দানে আহত ও পিপাসার্ত সৈনিকের পানি হাতে পাওয়ার পর নিজে পান না করে অপর আহত সৈনিকদের আগে পান করাতে বলা এবং নিজে পিপাসায় মৃত্যু বরণ করা।

৫. তৎকালীন পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি অপরাধপ্রবণ ও অসভ্য দেশে কয়েক বছরের মধ্যে অপরাধের সংখ্যা প্রায় শূন্যের কোঠায় চলে আসা।

খ. বর্তমান বিশ্বের উদাহরণ

বর্তমান বিশ্বে সৌদি আরবে কুরআনের আইনের মাত্র কয়েকটি অপরাধের (চুরি, হত্যা ইত্যাদি) শাস্তি (প্রকাশ্যে হাত ও গলা কাটা ইত্যাদি) চালু আছে। এর ফলস্বরূপ দেখা যায়– বর্তমান বিশ্বের সকল তথাকথিত উন্নত দেশের তুলনায় সৌদি আরবে অপরাধের সংখ্যা অনেক অনেক কম।

তাই এ কথা নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায়– মানুষ যদি অন্তত দুনিয়ায়ও প্রকৃত শান্তি পেতে চায়, তবে ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, তাদের কুরআনের আইনের ছায়াতলে ফিরে আসতে হবে। আর পৃথিবীর সকল বিবেকবান (Common sense-ধারী) মানুষ, যারা চায় মানব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক, তাদেরকে কালবিলম্ব না করে কুরআনের আইনকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এগিয়ে আসা উচিত। আর যারা শুধু নিজে শান্তিতে থাকতে চায়, তাদেরও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসা দরকার। কারণ সমাজে শান্তি না থাকলে সে একা কোনোভাবেই শান্তিতে থাকতে পারবে না।

সবশেষে সকলকে সবিনয়ে অনুরোধ করছি, পুস্তিকায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে আমাকে অবশ্যই জানাবেন। পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরিয়ে ছাপা হবে ইনশাআল্লাহ। আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ!

সমাপ্ত

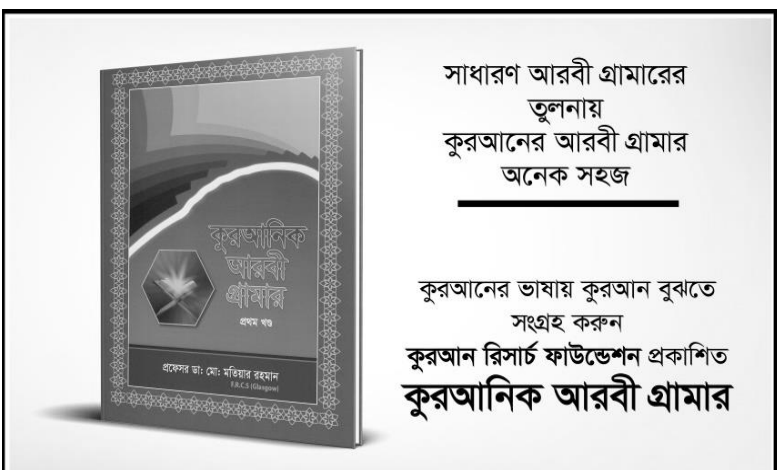

লেখকের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. ওজু-গোসলের সাথে কুরআনের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের নীতিমালা (চলমানচিত্র)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণি বিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র

২৩. অমুসলিম পরিবার বা সমাজে মানুষের অজানা মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না?

২৪. আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয় তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র

২৬. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা

২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?

২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা

৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্ব মানবতার মূল শিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে

৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) হওয়া আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?

৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা

৩৩. প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?

৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব

৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হজ্জের ভাষণ (বিদায় হজ্জের ভাষণ) যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও শিক্ষা

৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য

৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য

৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা

৩৯. আসমানী গ্রন্থে উপস্থিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের তথ্যধারণকারী জীবন্তিকা

মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া জীবন
ঘনিষ্ঠ মৌলিক বার্তা ও গবেষণা
সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ
সংক্ষেপে ও সহজে উপস্থিত আছে
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
প্রকাশিত **মৌলিক শতবার্তা** বইয়ে।

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (আরবী ও বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড
৪. শতবার্তা
(পকেট কণিকা, যাতে আছে আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৫. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান
(যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)
৬. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড

প্রাপ্তিস্থান

➢ **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এ্যান্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
ফোন : ৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭

➢ **অনলাইনে অর্ডার করতে : www.shop.qrfbd.org**

➢ **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫

এছাড়াও নিম্নোক্ত লাইব্রেরিগুলোতে পাওয়া যায়–

❖ **ঢাকা**

➢ **আহসান পাবলিকেশন্স**, কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা,
মোবাইল : ০১৬৭৪৯১৬৬২৬

➢ **বিচিত্রা বুকস এ্যান্ড স্টেশনারি**, ৮৭, বিএনএস সেন্টার (নিচ তলা),
সেক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা, মোবা : ০১৮১৩৩১৫৯০৫, ০১৮১৯১৪১৭৯৮

➢ **প্রফেসর'স বুক কর্ণার**, ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭,
মোবা : ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪

➢ **সানজানা লাইব্রেরী**, ১৫/৪, ব্লক-সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, মোবা : ০১৮২৯৯৯৩৫১২
➢ **আইডিয়াল বুক সার্ভিস**, সেনপাড়া (পর্বতা টওয়ারের পাশে), মিরপুর-১০, ঢাকা, মোবা : ০১৭১১২৬২৫৯৬
➢ **আল ফারুক লাইব্রেরী**, হযরত আলী মার্কেট, টঙ্গী বাজার, টঙ্গী, মোবা : ০১৭২৩২৩৩৩৪৩
➢ **মিল্লাত লাইব্রেরী**, তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা গেইট, গাজীপুর মোবাইল : ০১৬২৫৯৪১৭১২, ০১৮৩০৪৮৭২৭৬
➢ **বায়োজিদ অপটিক্যাল এন্ড লাইব্রেরী**, ডি.আই.টি মসজিদ মার্কেট, নারায়ণগঞ্জ, মোবা : ০১৯১৫০১৯০৫৬
➢ **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, মোবা : ০১৭২৮১১২২০০
➢ **মমিন লাইব্রেরী**, ব্যাংক কোলনী, সাভার, ঢাকা, ০১৯৮১৪৬৮০৫৩
➢ Good World **লাইব্রেরী**, ৪০৭/এ খিলগাঁও চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৯ মোবাইল : ০১৮৪৫১৬৩৮৭৫
➢ **ইসলামিয়া লাইব্রেরী**, স্টেশন রোড, নরসিংদী, মোবাইল : ০১৯১৩১৮৮৯০২
➢ **প্রফেসর'স পাবলিকেশন'স,** কম্পিউটার মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা মোবাইল : ০১৭১১১৮৫৮৬
➢ **কাটাবন বইঘর,** কাটাবন মোড় , মসজিদ মার্কেট, শাহাবাগ, ঢাকা মোবাইল : ০১৭১১৫৮৩৪৩১
➢ **আল-মারুফ পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট ,কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৫৭৫৩৮৬০৩, ০১৯৭১৮১৪১৬৪
➢ **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট ,কাটাবন মোড়, শাহবাগ, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
➢ **আল-মদীনা লাইব্রেরী,** ইসলামীয়া র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল : ০১৫৩৭১৬১৬৮৫
➢ **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল : ০১৮২২১৫৮৪৪০
➢ **আল-ফাতাহ লাইব্রেরী,** ইসলামীয়া র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৮৯৫২০৪৮৪
➢ **আলম বুকস,** শাহ জালাল র্মাকেট, নীলক্ষেত, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৬০৬৮৪৪৭৬

- **কলরব প্রকাশনী**, ৩৪, উত্তরবুক হল রোড, ২য় তলা, বাংলা বাজার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৫০০৩৬৭৯২
- **ফাইভ স্টার লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী**, ৩১৪ মীর হাজিরবাগ, মিল্লাত মাদ্রাসা গেট, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭১২০৪২৩৮০
- **আহসান পাবলিকেশন্স**, ওয়ারলেছ মোড়, বড়ো মগবাজার, ঢাকা। মোবাইল : ০১৮৬৬৬৭৯১১০
- **বি এম এমদাদিয়া লাইব্রেরী**, পূর্ব গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা। মোবাইল : ০১৯১২৬৪১৫৬২
- **দারুত তাজকিয়া**, পূর্ব গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা। মোবাইল : ০১৫৩১২০৩১২৮, ০১৭১২৬০৪০৭০
- **মাকতাবাতুল আইমান**, পূর্ব গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা। মোবাইল : ০১৯১৮৮৫৫৬৯৭
- **আস-সাইদ পাবলিকেশন**, পূর্ব গেইট, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা। মোবাইল : ০১৮৭৯৬৩৭৬০৫

❖ চট্টগ্রাম

- **আজাদ বুকস্**, ১৯, শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম মোবা : ০১৮১৭৭০৮৩০২, ০১৮২২২৩৪৮৩৩
- **ফয়েজ বুকস**, শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম মোবা : ০১৮১৪৪৬৬৭৭২
- **আমিন বুকস সোসাইটি**, শাহী জামে মসজিদ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম মোবা : ০১৯১৯২২৪৭৭৮
- **নোয়া ফার্মা**, নোয়াখালী, মোবাইল : ০১৭১৬২৬৭২২৪
- **ভাই ভাই লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী**, স্টেশন রোড, চৌমুহনী, নোয়াখালী, মোবাইল : ০১৮১৮১৭৭৩১৮
- **আদর্শ লাইবেরী এডুকেশন মিডিয়া**, মিজান রোড, ফেনী মোবাইল : ০১৮১৯৬০৭১৭০
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী**, ইসলামিয়া মার্কেট, লাকসাম, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৭২০৫৭৯৩৭৪
- **আদর্শ লাইব্রেরী**, দেবিদ্বার, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৮৬২৬৭২০৭০
- **ফয়জিয়া লাইব্রেরী**, সেকান্দর ম্যানশন, মোঘলটুলি, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৭১৫৯৮৮৯০৯
- **মোহাম্মাদিয়া লাইব্রেরী**, নতুন বাজার, চাঁদপুর, মোবা : ০১৮১৩৫১১১৯৪

❖ রাজশাহী

- ইসলামিয়া লাইব্রেরী, সাহেব বাজার, রাজশাহী
  মোবা : ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩, ০১৭১৫-০৯৪০৭৭
- **আদর্শ লাইব্রেরী,** বড়ো মসজিদ লেন, বগুড়া,
  মোবা : ০১৭১৮-৪০৮২৬৯
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** কমেলা সুপার মার্কেট, আলাইপুর, নাটোর
  মোবাইল ০১৯২-৬১৭৫২৯৭
- **আল বারাকাহ লাইব্রেরী,** বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ, ০১৭৯৩-২০৩৬৫২

❖ খুলনা

- **তাজ লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা। ০১৭২৪-৮৪৩২৮৩
- **ছালেহিয়া লাইব্রেরী,** হেলাতলা মসজিদ মার্কেট, খুলনা,
  মোবাইল : ০১৭১১২১৭২৮৮
- **হেলাল বুক ডিপো,** ভৈরব চত্বর, দড়াটানা, যশোর। ০১৭১১-৩২৪৭৮২
- **এটসেটেরা বুক ব্যাংক,** মাওলানা ভাষানী সড়ক, ঝিনাইদহ।
  মোবাইল : ০১৯১৬-৪৯৮৪৯৯
- **আরাফাত লাইব্রেরী,** মিশন স্কুলের সামনে, কুষ্টিয়া, ০১৭১২-০৬৩২১৮
- **আশরাফিয়া লাইব্রেরী,** এম. আর. রোড, সরকারী বালিকা বিদ্যালয় গেট, মাগুরা। মোবাইল : ০১৯১১৬০৫২১৪

❖ সিলেট

- **সুলতানিয়া লাইব্রেরী,** টাউন হল রোড, হবিগঞ্জ, ০১৭৮০৮৩১২০৯
- **পাঞ্জেরী লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী,** ৭৭/৭৮ পৌর মার্কেট, সুনামগঞ্জ
  মোবাইল : ০১৭২৫৭২৭০৭৮
- **কুদরতিয়া লাইব্রেরী,** সিলেট রোড, সিরাজ শপিং সেন্টার,
  মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৬৭৪৯৮০০
- **বই ঘর,** মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮

ব্যক্তিগত নোট

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

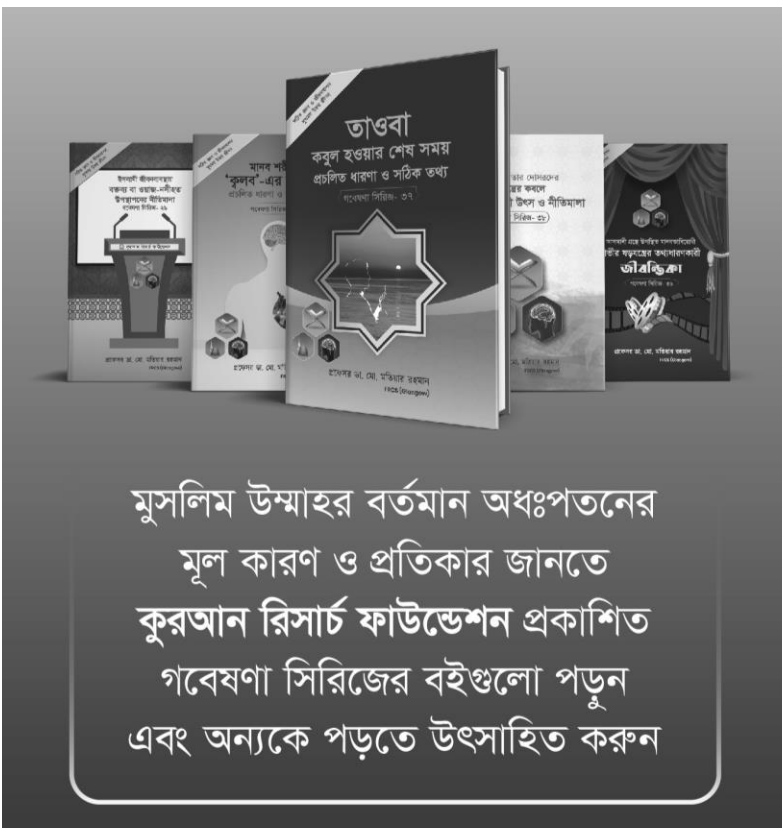
তাওবা
কবুল হওয়ার শেষ সময়
প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অধঃপতনের
মূল কারণ ও প্রতিকার জানতে
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত
গবেষণা সিরিজের বইগুলো পড়ুন
এবং অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন